আনন্দমেলা গল্পসঙ্কলন ৭

এতে যে গল্পগুলি আছেঃ-

1. আস্ট্রো স্কুলের ছাত্র — সিদ্ধার্থ ঘোষ
2. দি বোম্বটে ব্যায়াম সমিতি — সমীর মুখোপাধ্যায়
3. ধোবি পাট — সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
4. রাজার পেটে প্রজার পিঠে — মনোজ মিত্র
5. স্বর্গদ্বার — শিবতোষ ঘোষ
6. উড়ন্ত গালিচা এবং চন্দ্রকান্ত — সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

উড়ন্ত গালিচা এবং বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বিকেলে রোজকার মতো জিমকে সঙ্গে নিয়ে ঝিলের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। সেইসময় জিনিসটা চোখে পড়ল। প্রথমে ভেবেছিলুম, ওপাশের ওই বস্তির কোনও গরিবগুর্বো লোকের কাঁথা। ফিকে গোলাপি রঙের জমিনের ওপর কিছু আঁকিবুকি নকশা। পরে সন্দেহ হল, চৌকো জিনিসটা সম্ভবত কাঁথা নয়, অন্য কিছু। বালাপোশ নয় তো?

জিম বড্ড ছটফটে। খুদে চারটি ঠ্যাঙে ঘাসের ওপর প্রজাপতি তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। রামু ধোপার গাধাটা থাকলে সে অবশ্য তার পেছনেই লাগত। একটু আগে রামু দিনমানে শুকোতে দেওয়া কাপড়গুলো বোঁচকায় বেঁধে তার পিঠে চাপিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে।

পুরনো নকশি কাঁথা কিংবা বালাপোশের মতো জিনিসটা দেখতে দেখতে এও মনে হল, ভুল করে রামুই ওটা ফেলে গেছে। দিনের আলো কমে আসছিল। প্রজাপতিটা ঝোপের ভেতর উধাও হয়ে গেলে জিম ফিরে এল। তারপর তার চোখেও চৌকো জিনিসটা পড়ল। জিমের সবতাতে নাকগলানো স্বভাব। দৌড়ে জিনিসটার কাছে গেল। শুঁকল। তারপরই যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে পালিয়ে এসে আমার পায়ের ফাঁকে ঢুকল।

এবার একটু অবাক হলুম। জিম যত ছোট্টটি হোক, সহজে ভয় পায় না। চৌকো, ঈষৎ লম্বাটে একটা বালাপোশ অথবা নকশি কাঁথাকে তার ভয় পাওয়ার কারণ কী? হাত-পনেরো দূরে ঘাসের ওপর রোদ্দুরে শুকোতে দেওয়ার মতো বিছিয়ে রাখা জিনিসটার কাছে এগিয়ে গেলুম। জিম কিন্তু সেখানেই পেছনকার দু' ঠ্যাং মুড়ে বসে রইল। আমাকে অনুসরণ করল না।

কাছে গিয়ে দেখি, নেহাতই পুরনো একটা গালিচা। তা হলে যা ভেবেছিলুম, ঠিক তাই। রামুই ভুল করে এটা ফেলে গেছে। ভাবলুম, বাড়ি ফেরার পথে গালিচাটা রামুকে দিয়ে যাব। কিন্তু ওটার দিকে ঝুঁকে হাত বাড়াতেই কিসের ধাক্কায় আছাড় খেলুম। যেন অদৃশ্য একটা হাত আমাকে ঠেলে ফেলে দিল, কিংবা ইলেকট্রিক শকে শরীর অবশ হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। বিশেষ করে মাথার ভেতর কেমন একটা শিরশির ঝিমঝিম ভাব।

হকচকিয়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছি, একটু তফাতে ঝিলের জলের ধারে একটা ঝোপের মাথায় বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের মুখ দেখা গেল এবং মুখে চাপা হাসি। বললেন, "কী বুঝলেন, বলুন?"

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললুম, "কিচ্ছু বুঝলুম না।"

"বুঝিয়ে দিচ্ছি।" বিজ্ঞানীপ্রবর ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। হাতে ছোট্ট টর্চের মতো কালো কী একটা যন্ত্র। যন্ত্রটার বোতাম টিপে বললেন, "এবার লক্ষ করুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন।"

আমাকে আরও ভড়কে দিয়ে গালিচাটা প্রকাণ্ড ঘুড়ির মতো নিঃশব্দে আকাশে উঠে গেল। তারপর ভেসে রইল। এবার খ্যাখ্যা করে হাসতে হাসতে বললুম, "আপনার মাথায় যতসব উদ্ভুট্টে ব্যাপার আসে বটে! ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, হারু দর্জি রং-বেরঙের টুকরো কাপড় জোড়া দিয়ে এমনিই প্রকাণ্ড একটা ঘুড়ি বানিয়েছিল। এসব বড় ঘুড়িকে বলা হত ঢাউস। জোরে বাতাস বইলে ঢাউস ওড়ানো হত। তবে হারু দর্জির ঢাউসটা ছিল কাপড় দিয়ে তৈরি এবং সেটা সত্যিই উড়েছিল। এস· ডি· ও· ছিলেন রেনবোসায়েব। পঞ্চাশ টাকা বখশিশ দিয়েছিলেন হারু দর্জিকে। রেনবোসায়েব এখন বেঁচে থাকলে আপনাকেও বখশিশ দিতেন। আপনি আস্ত গালিচা ওড়াতে পেরেছেন..."

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "কী আবোল-তাবোল বলছেন! এ আপনার ঢাউস-টাউস নয়, লক্ষ করছেন না? তা ছাড়া কোনও সুতো বা দড়ি আটকানোও নেই।"

"নেই! আজকাল রেডিও-টিভির যুগে বিনি সুতোয় ঘুড়ি বা ঢাউস ওড়ানো কী আর কঠিন! রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমও ডাল-ভাত হয়ে গেছে।" বলে ওঁর হাতের যন্ত্রটার দিকে আঙুল নির্দেশ করলুম। "আমার ভাগ্নে ডনও একটা রিমোট কন্ট্রোল যন্তর কিনেছে। দূর থেকে বোতাম টিপে টিভি চালায়। চন্দ্রকান্তবাবু, বরং এমন কিছু তৈরি করুন, যা সত্যিই কল্পনা করা যায় না।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের আঁতে যেন ঘা লাগল। গুম হয়ে বললেন, "আশ্চর্য! আপনার চোখ থেকেও নেই। তাকিয়ে দেখুন, গালিচাটা ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে ভেসে আছে। ঘুড়ি বা আপনার ঢাউস-টাউসের পক্ষে এটা সম্ভব নয়, সে-কথা ভাবছেন না?"

"বৈদ্যুতিক ঢাউস। তাই সমান্তরালে ভেসে আছে," বলে জিমকে কোলে তুলে নিলুম। ততক্ষণে সে আমার পায়ের ফাঁকে এসে ঢুকেছিল। এই বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে সে কেন যেন বেজায় ভয় পায়।

চন্দ্রকান্ত খুট করে যন্ত্রটার বোতাম টিপলেন। উড়ন্ত গালিচাটা নিঃশব্দে নেমে এসে ঘাসে পড়ল। বললেন, "আপনি 'আরব্য রজনী' পড়েননি বোঝা যাচ্ছে। বাড়ি ফিরে লাইব্রেরিতে যান। পড়ুন। তারপর সব বুঝবেন।"

একটু অবাক হয়ে বললুম, "আরব্য রজনী মানে, থাউজ্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়ান নাইটস?"

বিজ্ঞানী গম্ভীর হয়ে বললেন, "হ্যাঁ। ওতে উড়ন্ত গালিচার গল্প আছে।"

সঙ্গে-সঙ্গে গল্পটা মনে পড়ে গেল। বললুম, "পড়েছি। চার ভাই উড়ন্ত গালিচায় চেপে..."

চন্দ্রকান্ত আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "এই সেই উড়ন্ত গালিচা!"

"কিন্তু সে তো গল্প!"

"গল্পকে আমি সত্যে পরিণত করেছি," বিজ্ঞানী ভরাট গলায় বললেন। তারপর ফিক করে হেসে ফেললেন। "ইচ্ছে ছিল, রামুর গাধাটাকে দিয়েই এক্সপেরিমেন্ট করব। হতচ্ছাড়া গাধাটা কিছুতেই এদিকে এল না। হ্যাঁ, বলতে পারেন, রামুকে দিয়েই এক্সপেরিমেন্ট করলুম না কেন? আসলে রিস্ক নিতে সাহস পেলুম না। যদি দৈবাৎ রামু ভয় পেয়ে উড়ন্ত গালিচা থেকে ঝাঁপ দেয়, হাড়গোড় ভেঙে মারা পড়বে। গরিব মানুষ!"

"নিজেকে দিয়েই এক্সপেরিমেন্ট করছেন না কেন?"

"অসুবিধে আছে," বলে চন্দ্রকান্ত রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটা দেখালেন। "নীচে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে এর সাহায্যে উড়ন্ত গালিচার গতিবিধি কন্ট্রোল করতে হবে কাউকে। গালিচাটায় চেপে তা করা যাবে না, সেটাই সমস্যা। বলবেন, তা হলে গালিচার সঙ্গে কোনও কন্ট্রোল-সিস্টেম জুড়ে দিচ্ছি না কেন? দিচ্ছি না এই কারণে যে, তা হলে ওটার স্বাভাবিকতা নষ্ট হবে। গালিচার গালিচাত্ব গেলে সেটা আর কি গালিচা থাকে, বলুন আপনি? যেমন ধরুন, জলের তরলতা না থাকলে সেটাকে আপনি কেন জল বলবেন?"

এই অকাট্য যুক্তিতে সায় না দিয়ে উপায় নেই। বললুম, "ঠিক, ঠিক। তা হলে বরং এক কাজ করুন। আপনার রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমটা আমাকে বুঝিয়ে দিন। দিয়ে আপনি গালিচায় উঠে পড়ুন।"

চন্দ্রকান্ত জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "আপনার এ-বিষয়ে কোনও ট্রেনিং নেই। অত্যন্ত জটিল সিস্টেম। একটু হেরফের ঘটলেই অ্যাকসিডেন্ট হবে।" বলে মুখে কাঁচুমাচু ভাব ফোটালেন। তার সঙ্গে

একটু করুণ হাসিও ফুটে উঠল। "আসলে আমি ঝোপের আড়ালে ওত পেতে বসে ছিলুম, যদি দৈবাৎ কেউ এসে ওটার ওপর বসার লোভ সম্বরণ করতে না পারে, তা হলেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ। আপনাকে আসতে দেখে মনে খুব আশা জাগল। তারপর দেখলুম, আপনার কুকুরটা এগিয়ে আসছে গালিচার দিকে। শুভ মুহূর্ত আসন্ন। আমি তৈরি। কিন্তু কুকুরের এই বিচ্ছিরি স্বভাব। প্রথমে শুঁকতে এল। ব্যস! শক খেল। তারপর আপনিও এলেন। ভাবলুম, গালিচা বিছানো দেখে আরাম করে বসে পড়বেন। কিন্তু আপনিও তাই!" বিজ্ঞানীপ্রবর খপ করে আমার একটা হাত ধরে ফেললেন এবং অমনি জিম আমার কাঁধে উঠে পড়ল। "প্লিজ, আপনি রামুর মতো আকাট মুখ্যু নন। আপনার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কথা দিচ্ছি, আপনার একটুও ক্ষতি হবে না। জাস্ট মিটার দু-তিন উচ্চতায় যদি আপনাকে ওঠানো যায়, এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল!"

একটু ভেবে বললুম, "ঠিক আছে। কিন্তু ম্যাক্সিমাম তিন মিটার হাইট, কথা দিন।"

চন্দ্রকান্ত খুশি হয়ে বললেন, "দিলুম। ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড। নিন, বসে পড়ুন।"

একটু ভয়ে-ভয়ে বললুম, "তখনকার মতো শক খেয়ে পড়ে যাব না তো?"

"ওটা আসলে মেন্টাল শক," বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা করলেন, "ফোটন-কণিকার অদৃশ্য একটা রেলিং দিয়ে গালিচাটা ঘেরা আছে। জাস্ট একটুখানি শক্ লাগবে, সেটার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে ব্যাপারটা কিছুই নয়। তখন আপনি এটা জানতেন না বলেই ওই মৃদু শকে আঁতকে উঠেছিলেন।"

বলেই আমাকে আচমকা এক ধাক্কায় ঠেলে গালিচার ওপর বসিয়ে দিলেন। এবার সত্যিই কোনও শক টের পেলুম না। অবশ্য চন্দ্রকান্তের বড় ধাক্কার তুলনায় ফোটনের ছোট ধাক্কা টের না পাওয়ারই কথা। গালিচাটায় আরাম করে বসলুম। জিম আমার কোলে সেঁটে রইল।

ততক্ষণে দিনের আলো ধূসর হয়ে গেছে। একটু দূরে খেলার মাঠ থেকে খেলুড়েরা চলে গেছে। ঝিলের জল থেকে নরম আলোর রং মুছে কুয়াশা ঘনিয়ে উঠেছে। ঝিলের ধারে এই জায়গাটা একেবারে নিরিবিলি সুনসান এলাকা। শুধু রামু ধোপা আর তার গাধাটা ছাড়া এখানটায় সচরাচর কেউ আসে না। ঝিল, ঘাস, ঝোপঝাড়, পুরনো শিবমন্দির ফাটিয়ে বিশাল বট, সব মিলিয়ে এই সন্ধ্যার মুখে কেমন একটা গা-ছমছম করা পরিবেশ।

চন্দ্রকান্ত রেডি বলামাত্র ইচ্ছের বিরুদ্ধে চোখ বন্ধ করেছিলুম। মেন্টাল শকের ব্যাপার আর কি। আরব্য উপন্যাসের সেই উড়ন্ত গালিচার রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত মুহূর্তের জন্য আবার মনে ঝিলিক দিয়েছিল। তারপর চোখ খুলেই চমকে উঠলুম।

তিন মিটার উঁচু কি, তিনহাজার মিটার উঁচু বলেই মনে হল। একেবারে আকাশে পৌঁছে গেছি এবং নীচে সবকিছু ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে। দিগন্তে লাল গোলার মতো সূর্যটা আস্ত ভেসে আছে। আমার গায়ে গোলাপি ঝলমলে রোদ্দুর। "বিশ্বাসঘাতক," বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। তারপর বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে যথেচ্ছ গালাগালি শুরু করলুম। চ্যাঁচামেচি করে গলা ভেঙে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। তবে এই আজব গালিচা থেকে পড়ে যাওয়ার ভয়ে একটুও নড়াচড়া করছিলুম না, এই যা। জিমও ভয় পেয়ে গুটিসুটি বসে রইল।

গালিচাটা ফোমের গদির মতো নরম। কিন্তু দিব্যি টানটান হয়ে আছে। একটা চৌকো শক্ত জিনিসের মতো ভেসে চলেছে আকাশ-পথে। একটু পরে সূর্য মিলিয়ে গেল। ঝাঁকে-ঝাঁকে তারা ফুটে উঠল চারদিকে। জিম আমার কোলে তেমনই সেঁটে গিয়ে চুপটি করে বসে রয়েছে। নীচের পৃথিবী দেখতে দেখতে কালো হয়ে গেল।

হয়তো ঘুমের টান এসেছিল, আকাশ-ভরা তারা দেখতে দেখতে নিশুতি রাতের আমেজ মানুষকে ঘুমের দিকে টানতেই পারে। হঠাৎ চাপা শনশন শব্দে সেই আমেজটুকু চলে গেল। টের পেলুম উড়ন্ত গালিচাটা এবার দ্রুত নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে। শনশন শব্দের সঙ্গে গালিচাটার চারদিকে ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গ ঝিকমিকিয়ে উঠছে।

কিন্তু নামছি তো নামছি। অতল খাদে নেমে যাওয়ার মতো গা-শিরশির করা একটা অনুভূতি চমকে দিচ্ছে এবং মাঝে-মাঝে ভয়ে চোখ বন্ধও করছি। একটু পরে নীচে জুগজুগে আলো দেখে সাহস পেলুম। সম্ভবত আমাদের ছোট্ট শহরটারই আলো, যদিও আলোগুলোর সংখ্যা খুব কম। হয়তো লোডশেডিং চলেছে এবং শুধু সরকারি বাড়িগুলোতেই আলো জ্বলছে। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তকে একচোট বকাঝকা করব বলে মনে-মনে তৈরি হলুম। স্বীকার করছি,এ-একটা দারুণ তাক-লাগানো ঘটনা। তা ছাড়া অদ্ভুত একটা আকাশভ্রমণও হয়ে গেল। কিন্তু দৈবাৎ দুর্ঘটনাও তো ঘটতে পারত! তার চেয়ে বড় কথা, ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড বলে তিন মিটারের জায়গায় তিন হাজার। কেন, তিরিশ হাজার মিটার উঁচুতে তুলে ঘুড়ির খেল দেখানো? নিকুচি করেছে এক্সপেরিমেন্টের। আমি মানুষ, না গিনিপিগ?

আজব গালিচা-বিমান যেখানে নামল, সেখানে ঘুরঘুট্টে আঁধার। নামার সময় ভেবেছিলুম একটু ধাক্কা লাগতেই পারে। প্লেন রানওয়েতে ল্যাণ্ড করার সময় যেমনটি হয়। কিন্তু তেমন কিছুই টের পেলুম না। এমনকী, গালিচা যে মাটি ছুঁয়েছে, সেটা বুঝতেও একটু সময় লাগল।

আমি উঠে দাঁড়ানোর আগেই জিম ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে গালিচা থেকে নেমে গেল। তারপর আমি পা বাড়িয়ে জুতোর তলায় ঝিলের ধারে সেই নরম ঘাসেরই সাড়া পেলুম। ঘন আঁধার ছমছম করছে। কিচ্ছু দেখা যায় না। এবার বিজ্ঞানীপ্রবরের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য তৈরি হয়ে ডাকলুম, "চন্দ্রকান্তবাবু!"

কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। বারকতক ডাকার পর ধরেই নিলুম, উনি ওঁর বাড়ি ফিরে ছাদে রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটি হাতে নিয়ে বসে আছেন। খেলার মাঠের দিকে এগিয়ে গেলুম। জিম আমার পায়ের কাছে সাবধানে হাঁটছে, কিংবা হাঁটতে তার ইচ্ছে করছে না। তাকে তুলে নিয়ে কাঁধে রেখে কয়েক পা এগিয়ে গেছি, সেইসময় সন্দেহ জাগল, জুতোর তলায় মসমস শব্দ হচ্ছে এবং পা দেবে যাচ্ছে। সত্যিই কি ঘাসের ওপর হাঁটছি? ঝুঁকে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে চমকে উঠলুম। কোথায় ঘাস? এ যে দেখছি স্রেফ বালি। হকচকিয়ে থমকে দাঁড়ালুম।

আমাদের শহরে কোনও বালিয়াড়ি নেই। ঝিলের ধারে তো নেই-ই। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝিলটা খুঁজলুম। আঁধার রাতেও ঝিলটা চোখে পড়ার কথা। ঝিলের জলে কত রাতে নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কোথায় সেই নক্ষত্রের ঝিকিমিকি? ততক্ষণে দৃষ্টিও কিছুটা স্বচ্ছ হয়েছে। আবছা দেখা যাচ্ছে এদিক-ওদিকে উঁচু, বিশাল উঁচু এবং ঘন কালো দেওয়ালের মতো পাহাড়। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। দূরে একটা আলো জুগজুগ করছিল। আলোটা লক্ষ করে এগিয়ে যাব কি না ভাবছি, সেই সময় হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি গজাল। গালিচাটা এভাবে ফেলে যাওয়া ঠিক নয়। বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটি সম্ভবত অকেজো হয়েই এ-ধরনের দুর্ঘটনা বাধিয়েছে। অথবা এমনও হতে পারে, এটা ওঁর একটা বিদঘুটে

রসিকতা ! কাজেই গালিচাটা সঙ্গছাড়া করা উচিত হবে না। ঘুরে দেখলুম, অন্ধকারে ওটা ঝিকমিক করছে। ফিরে গিয়ে ওটাকে গোটানোর চেষ্টা করলুম। দিব্যি গোটানো গেল। তারপর আরও দুমড়ে ভাঁজ করে বগলদাবা করলুম। এখন এটা স্রেফ একটা গালিচাই বটে !

দূরের আলোটার দিকে হেঁটে যাচ্ছিলুম। বালিতে দ্রুত হাঁটা যায় না। হাঁটছি তো হাঁটছি, আলোটার কাছে পৌঁছনো যাচ্ছে না। চোখের দৃষ্টি ক্রমশ অন্ধকারে পরিষ্কার হয়েছে। বুঝতে পারছি পাহাড়-ঘেরা একটা মরু-উপত্যকায় হেঁটে চলেছি। এ কোন মুল্লুকে কে জানে ! দুর্ভাবনায় বুক টিপটিপ করছে। গলা শুকিয়ে গেছে তেষ্টায়। তার ওপর হিম। এতক্ষণে হিমের হামলা ভালভাবেই টের পাচ্ছি। পরনে শুধু শার্ট আর প্যান্ট, পায়ে নেহাত একটা চপ্পল। ঠাণ্ডা বালি ঢুকে পা দুটো ক্রমশ নিঃসাড় হয়ে উঠেছে। মরিয়া হয়ে দৌড়নোর চেষ্টা করলুম। কিন্তু বালিতে দৌড়নো সোজা নয়। মনে হচ্ছিল, দম আটকে এখনই মারা পড়ব।

কতক্ষণ পরে আলোটার কাছাকাছি গিয়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় ধপাস করে বসে পড়লুম। আলোটা একটা মশাল। বালিতে পোঁতা দণ্ডের মাথায় জ্বলছে। সেই আলোয় একটা তাঁবু দেখা যাচ্ছে। তাঁবুর সামনে দু'জন প্রকাণ্ড কালো মানুষ অদ্ভুত পোশাক পরে দাঁড়িয়ে ছিল। দু'জনের কোমরেই চওড়া খাপে-ঢাকা তলোয়ার, এবং হাতে লোহার শূল।

তারা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখামাত্র দুর্বোধ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল। তারপর শূল তাক করে দৌড়ে এল। আঁতকে চোখ বন্ধ করলুম।

কিন্তু না। শূলের খোঁচা খেলুম না, আমার শরীরও

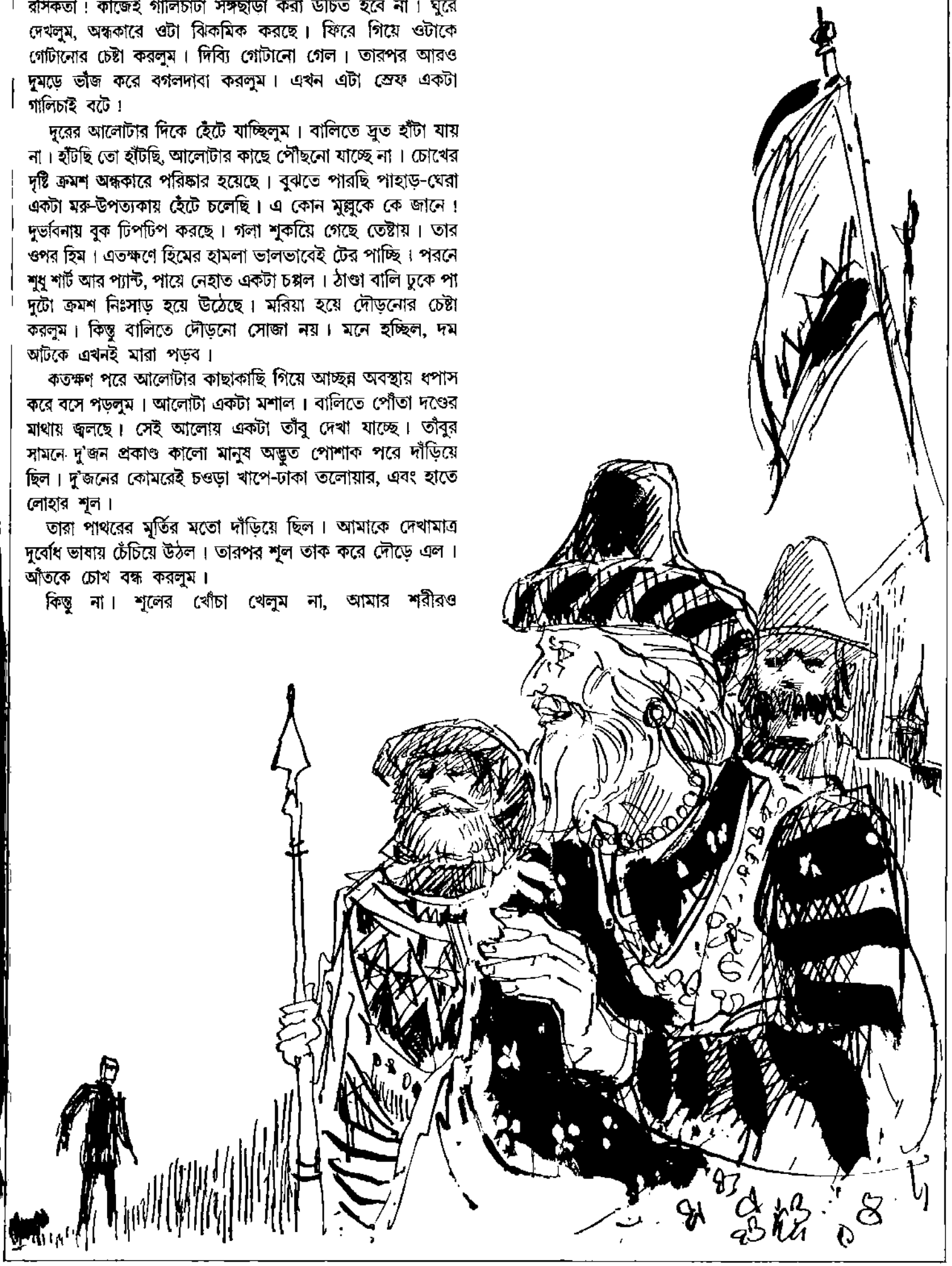

এফোঁড়-ওফোঁড় হল না। একটা হুলুস্থুলু এবং চাপা হইচই শুনে চোখ খুলে দেখি, সেই কালো বিশালকায় লোক দুটিকে ঠেলে সরিয়ে কয়েকজন নানাবয়সী ফর্সা রঙের লোক আমাকে দেখছে।। পরনে ঝলমলে আলখাল্লা, কোমরে চওড়া মখমলের বেল্ট এবং তাতে বাঁকা খাপে ঢাকা ছুরি গোঁজা, মাথায় ছুঁচলো টুপির সঙ্গে জড়ানো পাগড়ি, পায়ে নাগরা জুতো। কারও মুখে সাদা বা কালো দাড়ি, কারও পেল্লায় গোঁফ। সাদা দাড়িওয়ালা একটা লোক অবাক চোখে তাকিয়ে কিছু বলল। বুঝতে পারলুম না। তারপর সে এগিয়ে এসে জিমের দিকে আঙুল তুলে কী ইশারা করল, মুখে বিরক্তির স্পষ্ট ছাপ। এমনি শূলধারী কালো লোক দুটোর একজন শূল বাগিয়ে জিমকে খোঁচা মারতে এল। আমি জিমকে বুকে চেপে ধরলুম। বৃদ্ধ লোকটি তর্জনগর্জন করে ফের কিছু বলল। এবার শূলটি বালিতে বিঁধিয়ে রেখে খালি হাতে জিমকে ধরতে এল। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলুম। পারলুম না। লোকটা আস্ত দানো বললেই চলে। জিমকে কেড়ে নিল আমার হাত থেকে।

কিন্তু জিম মহা ধূর্ত। সে লোকটার হাতে কামড়ে দিল। কামড় খেয়ে লোকটা তাকে ছেড়ে দিতেই সে চোখের পলকে তাঁবুর পেছনে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল। বৃদ্ধ আবার গর্জন করে কিছু বলল। সেই কালো লোক দুটি যে হাবসি প্রহরী, ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি। তারা শূল বাগিয়ে জিমের খোঁজে দৌড়ে গেল।

বৃদ্ধ চোখ কটমট করে আমাকে দেখছিল এবং কিছু বলছিল। ভিড় থেকে আমার বয়সী এক যুবক এগিয়ে এসে আমার সামনে হাঁটু মুড়ে বসল। তার মুখে কিন্তু অমায়িক হাসি। সে হাত বাড়িয়ে প্রথমে আমার শার্ট, তারপর প্যান্টটা ছুঁয়ে দেখল। তারপর আমার একটা হাত নিয়ে মনোযোগ দিয়ে ঘড়িটা পরীক্ষা করল। এবার সাহস পেয়ে ইশারায় তেষ্টার কথা জানিয়ে দিলুম তাকে।

সে বুঝতে পারল। আমার হাত ধরে টেনে ওঠাল এবং তাঁবুর ভেতর নিয়ে গেল। ভিড়টা আমাদের অনুসরণ করে তাঁবুতে ঢুকল। শুধু বৃদ্ধ লোকটি গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

তাঁবুটা বেশ চওড়া। উজ্জ্বল লাল রঙের গালিচা বিছানো রয়েছে। অনেকগুলো সুন্দর তাকিয়া দেখতে পেলুম। দু'ধারে দুটো কাচের বাতিদানে সম্ভবত চর্বির বাতি জ্বলছে। মিঠে আগরবাতির গন্ধ মউমউ করছে। যুবকটি একটি সুদৃশ্য পেয়ালায় জল ঢেলে আমাকে দিল। ছোট্ট নকশাদার কাঠের টুলে সুন্দর একটি সেরাহিতে জল রাখা ছিল।

জল খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে ইংরেজিতে বললুম, "এটা কি পশ্চিম এশিয়ার কোনও দেশ?"

যুবকটি শুধু হাসল। একজন মধ্যবয়সী লোক অজানা ভাষায় তাকে কিছু বলল। সে মাথা দুলিয়ে কিছু জবাব দিল। তখন সেই লোকটি একটি চিনেমাটির থালায় একগোছা আঙুর, একটা আপেল, পনিরজাতীয় সাদা কী জিনিস আর একটা প্রকাণ্ড তন্দুরি রুটি এনে আমার সামনে রাখল। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। দেরি না করে খাওয়া শুরু করলুম। লোকগুলো আমার খাওয়া দেখে কেন কে জানে মুখ টিপে হাসতে লাগল আর চাপা গলায় কী সব কথা বলতে থাকল। সেই বৃদ্ধ লোকটি তাঁবুতে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। তারপর গুম হয়ে এক কোনায় বসল। শুধু একটাই দুর্ভাবনা ছিল জিমের জন্য। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হাবসি প্রহরীদ্বয় হাঁফাতে-হাঁফাতে ফিরে এল। বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে হাত-মুখ নেড়ে কিছু বলল। অন্তত এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, জিমকে ওরা খুঁজে পায়নি।

আমার খাওয়া শেষ হলে দেখলুম একটি লোক তামাক সাজতে বসেছে। পুরনো ছবিতে যেরকম ফরাসি হুঁকো বা আলবোলা দেখেছি, তার মাথায় চমৎকার কলকেয় সে কাঠকয়লা পুড়িয়ে তামাক সেজে আমার দিকে নলটা সসম্ভ্রমে এগিয়ে দিল। ইশারায় বললুম, আমি তামাক খাই না। কিন্তু যুবকটি জোর করে আমার মুখে নল গুঁজে দিল। গন্ধটা সুন্দর। কিন্তু খকখক করে কেসে অস্থির হলুম। ওরা খুব হাসতে লাগল। এমনকী, সেই বদমেজাজি বৃদ্ধও এবার হেসে ফেললেন।

যুবকটি আমার হাত থেকে নল নিয়ে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিল। বৃদ্ধ তামাক খেতে থাকলেন। এই সময় কোনার দিকে একটি লোক বীণাজাতীয় একটা বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে বাজাতে শুরু করল। তারপর গান জুড়ে দিল। গানের সুরটা মন্দ নয়, তবে গলাটা বড্ড বেশি চড়া।

গানের আসর কিছুক্ষণ চলার পর যুবকটি আমাকে ইশারায় উঠতে বলল। তাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেলুম। এতক্ষণে পেছনেও কয়েকটি তাঁবু, মশাল এবং আরও হাবসি প্রহরীদের দেখতে পেলুম। কোনও-কোনও প্রহরীর পিঠে তীর-ধনুক। এখনও এরা তীর-ধনুক শূল-তলোয়ার ব্যবহার করে দেখে অবাক লাগছিল।

একটি ছোট তাঁবুর ভেতর ঢুকে দেখি, পাশাপাশি দুটি বিছানা পাতা রয়েছে। নকশাদার লেপ এবং বিছানা দেখে খুশি হয়েছিলুম। কিন্তু জিমের কথা মনে পড়ায় খুশিটা চলে গেল। ইশারায় যুবকটিকে জিমের কথা বোঝানোর চেষ্টা করলুম। কিন্তু সে আমলই দিল না। আমার হাতের ঘড়িটা আবার দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঘড়িটা খুলে তার হাতে পরিয়ে দিলুম। কিছুক্ষণ পরে থাকার পর কেন যেন ভয় পেয়েই সে ওটা খুলে নিতে ইশারা করল। তারপর বিছানায় শুয়ে লেপের তলায় ঢুকে পড়ল।

আমার ঘুম আসছিল না। ঘড়িতে ক'টা বাজল দেখতে গিয়ে লক্ষ করলুম, ঘড়িটা বন্ধ এবং তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, পৌনে ছ'টা বাজার পর ঘড়িটা থেমে গেছে। তার মানে, গালিচায় ওঠার পরই ঘড়ির কাঁটা থেমে গেছে। খুব ঝাঁকুনি দিয়ে নাড়াচাড়া করেও চালু করা গেল না। অগত্যা এ-নিয়ে আর মাথা ঘামালুম না। ভাঁজ-করা গালিচাটা আমি এতক্ষণ হাতছাড়া করিনি। করতেও চাইনে। সেটা পাশে গুঁজে রেখে লেপ-মুড়ি দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু খালি জিমের চিন্তা! এই মরু এলাকার প্রচণ্ড হিমে বেচারার কী অবস্থা হচ্ছে কে জানে! মনে-মনে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের মুণ্ডপাত করতে থাকলুম...।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। ঘুম ভেঙে গেল যুবকটির টানাটানিতে।

বাইরে বেরিয়ে উজ্জ্বল সকালের রোদে পরিবেশটা দেখে বোঝা গেল, চারদিকে ন্যাড়া পাথুরে পাহাড়-ঘেরা একটা মরু-উপত্যকাই বটে। পাঁচটা তাঁবু এবং একদঙ্গল উট নিয়ে যে লোকগুলো এখানে রাত কাটাল, তারা সওদাগর। কারণ উটগুলোর পিঠে হরেক পণ্যদ্রব্য চাপানো হচ্ছিল। সেই বৃদ্ধ এই সওদাগরদের দলপতি এবং যুবকটি তারই ছেলে, তাতে সন্দেহ নেই। রওনা হবার আগে সে নিজেকে দেখিয়ে বলল, "মোবারক।"

আমিও নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে বললুম, "জয়ন্ত।"

মোবারক ঝটপট বলল, "জয়েন! জয়েন! লা তো! জয়েন!" মাথামুণ্ডু বোঝা গেল না, সে কী বলছে। তার বাবা সবাইকে তাড়া দিচ্ছিল। শিগগির সওদাগরের দলটি উটের পিঠে পালকির মতো দেখতে একটা ঘেরাটোপে ঢুকে পড়ল। বইয়ে পড়েছিলুম, একেই তাঞ্জাম বলা হত সেকালে। একটি তাঞ্জামে আমি ও মোবারক উঠে বসলুম। আবার জিমের কথা মনে পড়ল। চারদিকে তাকিয়ে বালি আর পাথরের প্রকাণ্ড চাঁইয়ের ভেতর তাকে খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা

করছিলুম।

উটের ক্যারাভান হেলে-দুলে এগিয়ে চলল। কয়েক মাইল চলার পর সামনে পাহাড় এবং সঙ্কীর্ণ একটা গিরিপথ দেখতে পেলুম। গিরিপথ ক্রমশ ঢালু হয়ে মোটামুটি সমতল একটা এলাকায় নেমেছে। এতক্ষণে একটা ঝরনাধারা এবং তার দু'ধারে দাগড়া-দাগড়া সবুজ চোখে পড়ল। আঙুর, যবের খেত, আপেল-বাগিচা। মাঝে-মাঝে একটা করে বস্তি। পাথরের ঘরবাড়ি। পুরুষদের পরনে আলখাল্লার মতো পোশাক, মাথায় পাগড়ি। মেয়েদের মুখের ওপর কালো পর্দার জাল। ভিড় করে সওদাগর দলটিকে দেখছিল। মোবারকের পাশে আমাকে দেখামাত্র তারা দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে উঠছিল। হাবসি রক্ষীরা তাদের ধমক দিচ্ছিল। কখনও শূল বাগিয়ে তাড়া করছিল।

সূর্যের উত্তাপ বাড়ছিল ক্রমশ। দুপুরে অসহ্য অবস্থা। আবার একটা মরু-এলাকা পেরিয়ে গেলুম। তারপর একটা জনপদ দেখা গেল। কেমন রুক্ষ, ন্যাড়া চেহারার ঘরবাড়ি। কিন্তু একটু পরেই বুঝলুম এটা শহরতলি। শহরে ঢোকার মুখে সুদৃশ্য তোরণ দেখতে পেলুম। বাড়িগুলো এবার রীতিমত সুন্দর স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন বলা চলে। রাস্তায় দু'ধারে রং-বেরঙের পোশাকপরা মানুষজন আর কতরকমের পণ্য থরে-বিথরে সাজানো রয়েছে। মোবারক তাঞ্জামের পর্দা টেনে দিয়েছিল। বুঝলুম, আমাকে দেখে হইচই বেধে যাক, এটা তার পছন্দ নয়। পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে আমি অবশ্য শহরটা দেখছিলুম। কিছুক্ষণ পরে একটা বিশাল পাথরের প্রাসাদের ফটকে আমাদের উটটি ঢুকল। প্রাঙ্গণে ফুল বাগিচা আর ফোয়ারা। উট হাঁটু ভাঁজ করে বসল। মোবারক আমাকে প্রায় টেনে বের করে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে একটি ঘরে ঢোকাল। ঘরের ভেতর ঢুকে সে ইশারায় আমাকে চুপচাপ থাকতে বলল।

খাটে মখমলে-মোড়া তাকিয়া, বিছানায় জাজিম বিছানো। আমাকে বসিয়ে সে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এল, সঙ্গে তাগড়াই চেহারার একদঙ্গল বান্দা। একটা বিশাল রেকাবে একপ্রস্থ ঝলমলে পোশাক। রেকাবটা দেখিয়ে সে কিছু বলল এবং সেই সঙ্গে হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল, আমাকে এগুলো পরতে হবে।

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের গালিচাটা খাটে রেখে উঠে দাঁড়ালুম। বান্দারা আমার শার্ট খোলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। বেগতিক দেখে তাদের থামিয়ে নিজেই একটা আলখাল্লা তুলে নিলুম। মোবারক চন্দ্রকান্তের গালিচাটার দিকে তাকিয়ে ছিল। বেরঙা গালিচাটা খুলে দেখে সে বিরক্ত মুখে ছুঁড়ে ফেলল। আমি বাধা দেওয়ার আগেই একজন বান্দা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে কোথাও ফেলে দিতে গেল।

সবে আলখাল্লাটা পরতে যাচ্ছি, হঠাৎ মোবারকের বাবা এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকজন বিশাল ভয়ঙ্কর চেহারার লোক এসে ঘরে ঢুকল। মোবারক কী বলতে যাচ্ছিল, তার বাবা তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। দানোগুলোর কোমরে চওড়া খাপে-ঢাকা তলোয়ার ঝুলছে। একজন ঝনাত শব্দে তলোয়ার বের করে হুঙ্কার দিল। মোবারকের বান্দারা অমনি ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেল। অন্য একজন দানো আমাকে দু'হাতে তুলে ঘর থেকে বেরোল। আঁতকে আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। একটুও নড়াচড়া করলুম না। দানোগুলো যখন আমাকে নিয়ে চলেছে, রাস্তার দু'ধারে ভিড় করে লোকেরা আমাকে দেখছে। যেন এমন আজব প্রাণী তারা কখনও দ্যাখেনি!

একটা বিশাল তোরণের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেখানে ওরা আমাকে নামাল, সেখানে একটা ভিড়। চেহারা ও পোশাক দেখে মনে হল, এরা আমির-ওমরাই হবে। প্রত্যেকটি চোখে বিস্ময় ঝিলিক দিচ্ছে।

আমাকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে চলল সেই ভয়ঙ্কর দানোগুলো। হ্যাঁ, ওরা কখনও মানুষ হতে পারে না। এমন রাক্ষুসে বিকট চেহারা কোনও মানুষের হতে পারে, কল্পনা করা যায় না।

প্রকাণ্ড একটা ঘরে ওরা আমাকে ঢোকাল। সামনে উঁচুতে একটা সিংহাসন। সিংহাসনে যে লোকটা বসে আছে, সে বাদশা-সুলতান না হয়ে যায় না। একেবার কাছাকাছি আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দানোগুলো কুর্নিশ করে দু'পাশে দাঁড়াল।

বাদশা বা সুলতান আমাকে কিছুক্ষণ দেখার পর দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "কয়েদ!"

কয়েদ কথাটা আমার জানা। কয়েদ মানে জেল। কিন্তু কী দোষ করেছি যে, আমাকে জেলখানায় ঢোকানো হবে? করজোড়ে বললুম, "জাহাঁপনা! কসুর?"

বলেই বিপদ বাধালুম। সিংহাসন থেকে হুঙ্কারে কানে তালা ধরে গেল, "কোতল!"

সর্বনাশ! কেন যে মুখ খুলতে গেলুম! কোতল মানে তো ঘ্যাচাং করে মুণ্ডুতে এক কোপ। পুরো একটা কোপেরও দরকার হবে না। এই রাক্ষুসে বিশালকায় দ্বিপদ প্রাণীদের ওই প্রকাণ্ড তলোয়ার, শুধুমাত্র ঠেকালেই আমার কাটামুণ্ডু কয়েক মাইল দূরে গিয়ে ছিটকে পড়বে।

দানো-সর্দার তৈরিই ছিল। আমাকে বেড়ালছানার মতো তুলে দরবার থেকে বেরোল। দু'ধারে ওর সঙ্গীরা। মোবারকের বাবাকে আর দেখতে পেলুম না। বুড়ো কেন যে আমার ওপর খচে আছে, কে জানে। রাস্তার দু'ধারে লোকেরা তেমনই ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। আড় চোখে দেখলুম, পেছনে ভিড় করে তারা আসছে। কোতল করার জন্য নিশ্চয় কোনও বিশেষ জায়গা অর্থাৎ বধ্যভূমি আছে, সেখানেই দানো-জল্লাদেরা আমাকে নিয়ে চলেছে।

ঠিক তাই-ই। শহরের বাইরে একটা উঁচু বেদীর মতো জায়গা। সেখানে উঠে দানো-সর্দার আমাকে হাঁটু ভাঁজ করে বসতে ইশারা করল। একজন একটা পাত্রে তেল অথবা চর্বি এনে আমার ঘাড়ের পেছনে মালিশ করতে থাকল। চোখের কোনা দিয়ে দেখলুম, ভিড়ের ভেতর বেচারা মোবারক করুণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

মালিশ নয়, রদ্দা। রাম-রদ্দা বলাই উচিত। তবে একটা ব্যাপার ঘটল। অনেকদিন ধরে ঘাড়ের ব্যথায় ভুগছিলুম। মনে হল, এই রাম-রদ্দার দরুন সেটা সেরে যাচ্ছে।

কিন্তু সেরে গেলেই বা কী? ঘাড়ের ব্যথা সেরে যাওয়ার সুখ অনুভব করার সুযোগ তো আর নেই! ধড় আর মুণ্ডু আলাদা হয়ে গেলে সুখটা অনুভব করবে কে?

মৃত্যুর মুহূর্তে মনের নির্বিকার ভাব দেখে নিজেরই অবাক লাগছিল! কিঞ্চিৎ দার্শনিক চিন্তাও এসে গেল। ধড়-মুণ্ডু আলাদা হোক না! আত্মা? আত্মা তো থাকবে। আত্মা নাকি অজর, অমর। তবে এও ঠিক, আত্মা অর্থাৎ প্রেতাত্মা হয়ে আমার প্রথম কাজ হবে ওই বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে ভয় দেখানো। ওঁর বিজ্ঞানচর্চার বারোটা বাজিয়ে তবে ছাড়ব। ঝিলের ধারে বট গাছটায় গিয়ে বসে থাকব এবং আনাচে-কানাচে দেখতে পেলেই বিকট মূর্তিতে ভয় দেখাব। আস্ত কঙ্কাল হয়ে নিশুতি রাতে ওঁর জানালায় গিয়ে হাত ঢোকাব।

মালিশ শেষ হল। তখন দানো-সর্দার ইশারায় আমাকে মুণ্ডু টান-টান করে সামনে ঝুঁকে পড়তে ইশারা করল।

ঠিক এই সময় একটি ঘটনা ঘটে গেল।

চারদিকের ভিড়ে হঠাৎ হইহল্লার শব্দ এবং ভিড় ছত্রখান। দানো-সর্দার চ্যাপ্টা এবং প্রকাণ্ড তলোয়ারটি তুলেছিল কোপ মারার জন্য, থেমে গেল। এক মুহূর্তের জন্য মুখ তুলেই দেখলুম, জিম,

আমার প্রিয় জিম ছুটে আসছে এবং তার মুখে কামড়ানো সেই ভাঁজ-করা গালিচা।

দানো-সর্দার এবং তার সঙ্গীরা হকচকিয়ে উঠেছিল। জিম একলাফে বেদীতে উঠতেই হাত বাড়িয়ে তাকে তুলে নিলুম এবং গালিচাটা নিমেষে ছড়িয়ে তার ওপর বসে পড়লুম।

গালিচার চারদিকে ফোটন-কণিকার অদৃশ্য তাঞ্জাম আছে। দেখা যাক, জল্লাদ দানোগুলো হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে এসে শক খেয়ে কী করে! ঝিলের ধারে ওটা ছুঁতে গিয়ে 'মেন্টাল শক' হোক আর যাই হোক, আমি একটা শক তো খেয়েছিলুম!

ওরা অবশ্য ছুঁতে এল না, কিন্তু কোপ পড়ল, চারদিক থেকে সাঙ্ঘাতিক সব তলোয়ারের কোপ। মাথা নিচু করেছিলুম, যদিও তার দরকার ছিল না। ফোটন-কণিকার সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষে চারদিকে একরাশ স্ফুলিঙ্গ ঝিলিক দিল। অমনি ওরা ভয়ে তলোয়ার ফেলে দিল এবং হুম-হাম শব্দ করে বেদী থেকে ঝাঁপ দিয়ে নীচে পড়ল।

তারপরই গালিচাখানি সটান আকাশে উঠে গেল। বিকেলের উজ্জ্বল রোদে নীচের লোকগুলোকে পাথরমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। শহরের মাথার ওপর গালিচায় বসে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছি, আর ছাদে, অলিন্দে, সবখানে লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে।

সেই সুলতান বা বাদশার প্রাসাদের ওপর এসে দেখি, সেও ছাদে উঠে এসেছে এবং প্রচণ্ড হাত নাড়ছে। সেলাম করছে। আহা, এবার যদি ব্যাটাছেলের মুখের সামনে গালিচাটা নামত!

গালিচা আমার হুকুম তামিল করে আমাকেই তাক লাগিয়ে দিল। এবং হতচ্ছাড়া কোতলওয়ালা আমার সামনে লম্বা হয়ে পড়ল। বিড়বিড় করে অজানা ভাষায় কী বলতে বলতে কেঁদেও ফেলল। কিন্তু আমি গালিচা থেকে নামা নিরাপদ মনে করলুম না। হাত বাড়িয়ে ওর মাথা থেকে উষ্ণীষটা উপড়ে নিলুম এবং নিজের মাথায় পরলুম।

আরও কিছু করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু খেয়ালি গালিচা আবার তরতর করে আকাশে উঠে গেল। ভেসে চলল আগের মতো। বন্ধু মোবারকের সঙ্গে আর দেখা হল না! মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল।

ক্লান্তি তো বটেই, গত রাতে তাঁবুর ভেতর জিমের কথা ভেবে ভাল ঘুম হয়নি, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। এক সময় ঘুম ভেঙে গেল কার ডাকাডাকিতে।

চোখ খুলে দেখি, সন্ধ্যা নেমেছে এবং গালিচায় বসে আছি, জিম আমার কোলে। জায়গাটা চেনা লাগল। সামনে কয়েক হাত দূরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে এবং আমাকে ডাকছে, "নেমে আসুন জয়ন্তবাবু! এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল!"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত। খিখি করে খুব হাসছেন।

গালিচা থেকে ঝটপট নেমে এলুম। চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিলুম। সেই ঝিলের ধারেই পৌঁছেছি। কিন্তু...

চন্দ্রকান্ত সহাস্যে বললেন, "কী বুঝলেন?"

গুম হয়ে বললুম, "কিচ্ছু না।"

"সে কী! কী দারুণ জার্নি, সেটা বলুন!" চন্দ্রকান্ত তাঁর গালিচা গুটিয়ে বগলদাবা করে বললেন, "এবং কী সব ঘটল-টটল, তাও বিশদ বলুন!"

"দুঃস্বপ্ন," বলে পা বাড়ালুম। জিম আমার কাঁধে উঠে বসল।

"আহা! দুঃস্বপ্নটা কী, খুলে বলবেন তো মশাই!"

হাসবার চেষ্টা করে বললুম, "গত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় যা ঘটেছে, সবটাই একটা দুঃস্বপ্ন। তবে হ্যাঁ, আপনার ক্ষমতা অস্বীকার করছি না।"

"নো নো," বিজ্ঞানীপ্রবর বললেন, "মোটেও চব্বিশ ঘণ্টা নয়। জাস্ট একটা সেকেন্ডের ঘটনা মাত্র।"

একটু চটে গিয়ে বললুম, "সেকেন্ডের ঘটনা মানে? গতকাল ছিল ২৮ অক্টোবর, বুধবার। আর আজ হল ২৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার।"

"গতকাল নয়, আজ হল ২৮ অক্টোবর, বুধবার। আপনার ঘড়িতে ডেটিং সিস্টেম থাকলে দেখে নিন।"

"আমার ঘড়ি বন্ধ।"

"আহা, দেখুন না!"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলুম। ঘড়ি চলছে এবং তারিখ ২৮ অক্টোবরই বটে। এখন সন্ধ্যা ছ'টা ষোলো মিনিট। একটু ভেবে বললুম, "কিছু বুঝতে পারছি না! সম্ভবত আপনার গালিচায় কোনও রহস্যময় ব্যাপার আছে।"

"তা তো আছেই," চন্দ্রকান্ত হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "গালিচাসুদ্ধু আপনাকে আলোর গতিতে অর্থাৎ সেকেন্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল স্পিডে সময়ের উলটোদিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। তারই মধ্যে হঠাৎ রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম একটু বেগড়বাঁই করেছিল। আশা করি, সেজন্য আপনাকে কোনও বিপদে পড়তে হয়নি।"

থমকে দাঁড়িয়ে বললুম, "কী বলছেন!"

চন্দ্রকান্ত ফের খিকখিক করে হাসলেন, "কোনও বিপদে পড়েননি আশা করি?"

"পড়েছিলুম।"

"কী বিপদ?"

"জল্লাদ আমার মুণ্ডু কাটতে কোপ তুলেছিল। ভাগ্যিস জিম..."

কথা কেড়ে বিজ্ঞানী বললেন, "জিম-টিম নয়। আমিই সঙ্গে-সঙ্গে রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমের গণ্ডগোলটা ধরতে পেরেছিলুম। কিন্তু জল্লাদ আপনার মুণ্ডু কাটতে গেল কেন?"

একটু চটে গিয়ে বললুম, "আপনি আমাকে আরব্য উপন্যাসের দেশে পাঠালেন কেন? অন্য কোথাও পাঠালেই পারতেন।"

চন্দ্রকান্ত আমার হাত ধরে বললেন, "আরব্য উপন্যাসের মধ্যেই উড়ন্ত গালিচার গল্পটা আছে। কাজেই যাই হোক, ডিটেলস্ বলুন, শুনি।"

"আমি ক্লান্ত।"

"ঠিক আছে। চলুন, আমার ল্যাবে গিয়ে কফি খেতে খেতে যা-যা ঘটেছে, পুরোটা নিজের চোখেই ছবিতে দেখবেন। রিমোট কন্ট্রোলে পুরোটা ধরা পড়েছে।"

কিছুক্ষণ পরে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের ল্যাবে বসে কফি খেতে-খেতে ভিশন স্ক্রিনে আমার রোমাঞ্চকর অভিযানের দৃশ্য দেখছিলুম। কিন্তু মোবারকের সঙ্গে তার ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে স্ক্রিন ঝাপসা হয়ে গেল। চন্দ্রকান্ত বললেন, "জাস্ট এখান থেকেই কিছুটা অংশ মিস করেছি।"

এক মিনিট পরে স্ক্রিনে আবার দৃশ্য ফুটে উঠল। আরব্য উপন্যাসের সেই শহরের আকাশে ঘুরতে ঘুরতে সুলতানের প্রাসাদের ছাদে অবতরণ, উষ্ণীষহরণ, তারপর আবার উড়ে চলা এবং ঝিলের ধারে ফের অবতরণ। ছবি শেষ হলে বললুম, "কিন্তু সেই উষ্ণীষ কোথায় গেল?"

চন্দ্রকান্ত হাসলেন, "দোষ আপনারই। মাথায় ফিট করেনি। কোথায় খুলে পড়ে গেছে!" বলে চোখ নাচালেন, "জল্লাদের পাল্লায় পড়ার কারণ কী?"

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, "এবার একবার নিজে আলোর গতিতে আরব্য রজনীর পাতায় গিয়ে ঢুকুন। তা হলেই বুঝবেন!"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ধোবি পাট

সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

এবার বর্ষা যেতে দেরি করছে। আরম্ভও হয়েছিল দেরিতে। আশ্বিনের শেষেও হঠাৎ-হঠাৎ ভারী মেঘ করে বৃষ্টি নামে। দিন ছোট হতে শুরু করেছে। এমন সময় ইস্কুল ফেরত, ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে, গাড়ির কাচ বন্ধ করে, জল-জমা রাস্তায় আটকে থাকতে কারও ভাল লাগে। বিল্টুরও ভাল লাগছিল না। আজকেই হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বাড়ি যেতে পারলে মিল্টুর সঙ্গে অন্তত একটু ক্যারম খেলা যেত। কিন্তু বিকেল ঝাপসা হয়ে ওপরের আকাশ কেমন ঘোলাটে, মনমরা দেখাচ্ছিল।

মিল্টুর এখন ক্যারম খেলায় দারুণ ঝোঁক। কিন্তু বড্ড চোট্টামি করে। গালুকে নিয়েও মুশকিল। শান্ত হয়ে বসে খেলাধুলো করা ওর কুষ্ঠিতে লেখা নেই। ক্যারমের একটা পকেট ছিঁড়ে গেছে। সেখানে ঘুঁটি পড়লেই মেঝেতে গড়ায়, আর গালু ঘুঁটি কুড়িয়ে হয় দে-দৌড়, নয়তো মুখে পুরে চেখে দ্যাখে। বাঁদরামির একশেষ! আচ্ছা, ঘুঁটি ভিজে গেলে খেলতে অসুবিধে হয় না? আবার ফ্রেঞ্চ চক দিয়ে ঘষে ঠিকঠাক করতে হয়।

আধঘণ্টা বাদে বাড়ি পৌঁছল বিল্টু। পৌঁছেই হুলুস্থুলু কাণ্ড। ছোট্‌কা ভেতর উঠোনের দিকে তিনতলার বারান্দায়, অরণির দাঁড়ের পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল, "মার দিস কেল্লা। কী করেছিস সুধন্য! কাকা হই রে, সাষ্টাঙ্গে পেন্নাম কর! শ্রদ্ধাভক্তিও অভ্যেস রে। ওটাও প্র্যাকটিস করতে হয়।"

ঠাকুমা তিনতলায় সুধন্যদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলছেন, "মাথাটা একটু নিচু কর ভাই, যে তালঢ্যাঙা হয়েছিস।"

সুধন্যদা গাল নিচু করতেই গালে চুমু খেলেন ঠাকুমা। বিল্টু গাড়ি থেকে একলাফে উঠোনের জমা জল ডিঙিয়ে ভেতরের বারান্দায় উঠে হিরুদাকে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপার কী?"

হিরুদা একগাল হেসে বলল, "ধনুদাদা পাশ হয়ে গেল। সুধন্যবাবু এম. এ.।"

বিল্টু আনন্দে আত্মহারা হয়ে নীচ থেকে চিৎকার করল, "সুধন্যদা আমিও এসে গেছি।"

সুধন্যদা তার থেকেও জোরে উত্তর দিলে, "ওপরে চলে আয়, কাটলেট ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

মাখনজ্যাঠামশাই সকলকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। শিবরামদাদু, হরেজ্যাঠাও এসেছিলেন শিয়াখালা থেকে। শিবরামদাদু গরদের

ফতুয়া, কাঁচি ধুতি আর চকচকে পালিশ করা শুঁড়তোলা নাগরাই চটি পরে, মাখনজ্যাঠামশাইকে দাবড়াচ্ছিলেন। ওই অসম্ভব ফরসা, বেঁটেখাটো, নাদুসনুদুস মানুষটি রাগলে আপেলের মতো রেঙে ওঠেন। ভুরুজোড়া ঢেউ-এর মতো কপালে তুলে চোখ গুলি-গুলি করে বললেন, "দ্যাখ মাখন, মুখে-মুখে তক্কো করিসনি। ছেলেকে তুলোয় মুড়ে রেখে মানুষ করতে চাস ? অসম্ভব। তা হলে তোর মতো পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বয়সেই ব্লাডপ্রেশার হয়ে যাবে।" তারপর হাওয়ায় খামচি কাটার মতো ভঙ্গিতে সুধন্যদাকে কাছে ডেকে হাতের গুলি টিপে-টিপে পরখ করে বললেন, "বাঃ, ক'টা ডন আর ক'টা বৈঠক দিচ্ছিস ?"

সুধন্যদা লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বলল, "একশো ডন আর আড়াইশো বৈঠক।"

ব্যারিস্টার বি· বি· মুখার্জি মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে বললেন, "ওর সঙ্গে আরও পঞ্চাশটা বৈঠক যোগ করো কাকা। তবে সেগুলো মাখনদার নির্দেশে কান ধরে উঠোনে হয়। তাই তো রে সুধন্য ?"

"অ্যাঁ! সে কী রে মাখন ? তুই এরকম একটা ট্যালেন্টেড, রাজপুত্তুরের মতো ডিটেকটিভ···বাবা। কী যেন তোমার ছদ্মনাম ? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, 'ছিদ্রান্বেষী'। ওই ছিদ্রান্বেষী সুধন্যকে তুই কান ধরে উঠোনে ওঠবোস করাস ? ফের যদি এ-সব কথা শুনি, তবে আমিও তোকে তোর দোকানে নিল-ডাউন করিয়ে রাখব। আর, যে-কথা হচ্ছিল, শোন সুধন্য! মাখন যদি কিনে না দেয়, তবে আমিই তোকে রিভলভার কিনে দেব। একটা রিয়াল ডিকেটটিভের রিভলভারই নেই। ভাবা যায় ?"

মাখনজ্যাঠামশাই হাতজোড় করে ধরা গলায় বললেন, "দোহাই শিবুকা, রিভলভারের গুলি কিছু চকোলেট নয় যে, লোকে তারিয়ে তারিয়ে খাবে। আর আমার একমাত্র ছেলে মানুষ মেরে ফাঁসি যাচ্ছে, এই বয়সে এটা দেখবার আগেই আমি হার্টফেল করব! এই মোটে চুয়ান্ন বছর বয়সে, তোমার ভাইপো'র এই অকালমৃত্যুর শোক সামলানো তোমার পক্ষেও কষ্টকর হবে।"

"সামলে নেব। আলবাত সামলে নেব। আর তোমার হার্ট তো আর এম· এ· পরীক্ষা দেয়নি যে ফেল মারবে। আমি শার্লক হোমস থেকে শুরু করে রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের সব বই পড়ে দেখেছি, অরণ্যদেব, রিপকার্বিও পড়ে দেখেছি, কোথাও দেখিনি যে ডিটেকটিভের রিভলভার নেই! সে-বেচারিকে হুট করে ছাতা খুলে ঘাঘু ক্রিমিনালের মোকাবিলা করতে হয় ?"

মাখনজ্যাঠা আর্তকণ্ঠে বললেন, "শিবুকা, শোনো···"

"শোনো বললেই শুনছে কে ? একবার সিনটা ভাব···অতঃপর ছিদ্রান্বেষী সুধন্য দুই হস্তে দুই উদ্যত রিভলভার ও অপর হস্তে একটি জ্বলন্ত টর্চ জ্বালিয়া সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন! দ্রুম, দ্রুম, দ্রুম!"

সকলে হোহো করে হেসে উঠতেই শিবুদাদু কীরকম থতিয়ে গিয়ে ব্রেক কষলেন! "কেন, কিছু ভুল বললাম ?"

ছোট্‌কা বলল, "ডিটেকটিভের কি তিনটে হাত থাকে শিবুকা ?"

"দ্যাখো হিরণ্যগর্ভ, তোমরা আজকালকার ছেলে কিস্যু জানো না। ডিটেকটিভের যে কী থাকে আর কী থাকে না, এটা আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষের বিচার করা বোকামি। শশধর দত্ত পড়েছ ? দস্যু মোহন ? স্বপনকুমার পড়েছ ? কিস্যুই তো পড়োনি, অথচ হ্যাহ্যা করে হাসছ। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হলেই কিছু হয় না। এ-সব হচ্ছে জেনারেল নলেজ। সাধারণ জ্ঞান। একটু ওঠো, অনেকক্ষণ ধরে গন্ধ পাচ্ছি, উঠে দ্যাখো, পোলাও নেমেছে কি না! রেগে চ্যাঁচামেচি করলে আমার আবার খিদে পেয়ে যায়।"

প্রায় আধসের মাংসের কোর্মা, পোলাও দিয়ে মেখে খেয়ে ফেলে রুমাল দিয়ে ঠোঁটের কোণের ঝোলের দাগ মুছে, পরিতৃপ্ত মুখে শিবরামদাদু বললেন, "রান্নাটা মন্দ হয়নি। তবে কিনা, সবই করলি মাখন, তবু কিপটেমি করেছিস! একটু জাফরান পড়লে এই মাংসের ভোল পালটে যেত।"

কার্তিক ঠাকুর হাসিমুখে দরজার পাশ থেকে এগিয়ে এসে দাদুর পাতে মাংস দিতে-দিতে বলল, "জাফরান পড়েছে বড়বাবু। তবে আপনার কাছে ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে। জায়ফল মাত্র একটি দিয়েছি। আর কষবার সময় একটু চিনি দিয়ে কষলে, রংটা..."

"থামো হে! রাঁধো ভাল, তবে কথা কও বড় বেশি। সারাদিন মাখনের কথা শুনে শুনে বুদ্ধি গুলিয়ে গেছে। বড়রা কথা বললে চুপ করে শুনে যেতে হয়। উত্তর দিতে নেই। রান্না ঠিকই হয়েছে। তা নয়তো কি মুখে দিতুম! মাখন, আমার এই সোনার চাঁদ নাতিটাকে সবসময় তুলোধোনা করে বাবাগিরি ফলাতে পারে, আর আমি একদিন ওর ওপর কাকাগিরি ফলাব না। কী রে মাখন! ঠিক বলেছি তো?"

মাখনজ্যাঠা মুচকি হেসে মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ শিবুকা, ওরা আজকালকার লোক। এ-সব কথার ভেতরের মানে বুঝবে না। তবে তুমি আমাকে আর-একটা চান্স দাও।"

"কিসের চান্স? আর-একটা এরকম নেমন্তন্ন? কভি নেহি। এরপর আমার চান্স। আমি খাওয়াব। মাংসর পাঁচরকম পদ হবে। সঙ্গে থাকবে শাহি পুলাও আর মুঘলাই পরোঠা। যার যা পছন্দ। তবে আজকালকার কায়দার মতো চিনে বা সায়েবি রান্না নয়। মোগলাই রান্না। তার তরিবতই আলাদা। এই মাংসের কোর্মায় গোলাপজল পড়বে।"

বাবা বললেন, "যা বলেছেন কাকা। সায়েবরা রান্নার কী জানে। বিলেতে আমার ল্যান্ডলেডি, সকালের ব্রেকফাস্ট টেবিলে গদগদ হাসিমুখে এক প্লেট আলুসেদ্ধ চটকে, পাশে দুটি ডিমসেদ্ধ দিয়ে, টেবিলে ফুলদানি সাজিয়ে, নুন-মরিচগুঁড়োর ট্রে সাজিয়ে এগিয়ে দিয়ে বলত, 'আই কুকড্ ইট স্পেশ্যালি ফর ইউ।' আ খেলে যা, ডিমসেদ্ধ-আলুসেদ্ধ আবার কুক কী গো! ও তো গরম জলে পাঁচ মিনিট ফোটালেই হয়ে যায়! ব্যাটারা এক নম্বরের হিপোক্রিট!"

সকলে হোহো করে হেসে উঠতেই বিল্টু ছোট্‌কাকে জিজ্ঞেস করল, "ছোট্‌কা! হিপোক্রিট মানে কী গো?"

"সরলভাবে বলতে গেলে যারা মনে-মুখে এক নয়, তাদের বলে হিপোক্রিট।"

এই নানা গালগল্পের মধ্যে সুধন্যদা রিভলভারের ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল।

দিন আট-দশ বাদে এক রবিবার সকালে, বাইরের রোদ্দুরে বেশ সোনা-সোনা রং ধরেছে, ঠিক এমন সময় বারান্দার ফোন বাজল। বিল্টু দাঁত মাজতে মাজতে ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে বলল, "হ্যালো!"

"হ্যালো। এটা কি 'পিন পয়েন্ট'? আমি চন্দ্রধরপুর এস্টেট থেকে বি· কে· মানে বিকাশকান্তি বলছি। মিঃ এক্স আছেন?"

বিল্টু থতমত খেয়ে গেল, "আপনি বোধহয় রং নাম্বার ডায়াল করেছেন।"

"এটা কি ৪৯ ৩১৯১?"

"হ্যাঁ।"

"তবে আজকের বিজ্ঞাপনে তো এই নাম্বারই আছে। অক্টোবর মাসে এপ্রিল ফুল করার মানে কী? আমি লালবাজারে রিপোর্ট করব।"

ভদ্রলোক দড়াম করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। বিল্টু অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে বেসিনে মুখ ধুচ্ছে, এমন সময় আবার টেলিফোন বাজল। একটু থতমত খেয়ে আবার তুলল বিল্টু।

"হ্যালো!"

"কে, বিল্টু? হাঃহাঃ, আমি মিঃ এক্স বলছি..."

"ধুস। সাতসকালে ইয়ার্কি মারছ কেন সুধনাদা?"

"ইয়ার্কি নয় ভাই। আজকের আনন্দবাজারটা নিয়ে এসে ব্যক্তিগত কলামটা দ্যাখ। আমাদের ডিটেকটিভ এজেন্সির বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়েছে। টেলিফোন নম্বরটা তোদের। কোনও কেস এলেই, পার্টির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে, আমাকে টেলিফোনে জানাবি। আমি চলে আসব।"

"নিজের টেলিফোন নম্বর দিলে না কেন?"

"খেপেছিস? আমি কি ইডিয়েট? একটা টেলিফোন ধরলেই বাবা আমার পিঠের চামড়া পরতে পরতে তুলে, রোদে শুকিয়ে আমসত্ত্ব বানাবে।"

"সেই চামড়াসত্ত্ব কে খাবে?"

"কেন, কাকে খাবে। ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে..."

"কাকে কাকের মাংস খায় না। বাড়িতে লালবাজার থেকে পুলিশ আসছে।"

"সে কী রে, কেন?"

"চন্দ্রধরপুরের বি· কে· ফোন করে মিঃ এক্সকে চাইলেন। আমি 'রং নাম্বার' বলতেই ভদ্রলোক চটে লাল। বললেন, 'অক্টোবরে এপ্রিল ফুল! আমি লালবাজারে ইনফর্ম করছি।'"

"সর্বনাশ। শোন, তুই ছোট্‌কা বা ধনাকাকাকে বলে ম্যানেজ করে নে। আমি অজ্ঞাতবাসে যাচ্ছি।"

"খবর্দার। থলি থেকে বেরাল বের করেছ, এখন বীরের মতো তার ম্যাও সামলাও।"

"তবে এক কাজ কর। রিসিভারটা পাশে নামিয়ে রাখ। আমি যাচ্ছি।"

ছোটকার বিছানার পাশে টিপয়ে বেড-টি ঠাণ্ডা হয়ে আছে। পাশে আনন্দবাজার পত্রিকা। বিল্টুর পায়ের আওয়াজে ছোট্‌কা চোখ না খুলেই বলল, "বামুনদি, আর-এক কাপ চা দাও।"

"আমি বিল্টু।"

"বল।"

"একটু পরে বলছি। আগে কাগজটা দেখি।"

বলে কাগজটা বিছানার ওপর মেলে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ব্যক্তিগত কলমে চোখ রাখতেই দেখল, দুটো বিজ্ঞাপনের পরেই সেই বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে।

যে কোনও রহস্য, তা যত জটিলই হোক, যোগাযোগ করুন : 'পিন পয়েন্ট'। মিঃ এক্স ; ফোন ৪৯ ৩১৯১।

বিজ্ঞাপনটা পড়ে ছোট্‌কার পিঠে একটা ধাক্কা মারল বিল্টু। ছোট্‌কা লাফিয়ে উঠেই বলল, "ব্রেক, ব্রেক!"

"কী ভুলভাল বকছ?"

"অ্যাঁ! ওঃ! স্বপ্ন! বাব্বা! দেখছিলাম যে, সুধন্য আমার মোটরবাইকটা স্টার্ট করে বাঁক নিতেই একটা বিরাট ষাঁড়কে ধাক্কা মারতে যাচ্ছে। বোঝ! ওই ষাঁড় খেপলে?"

"ধুর! কোথায় তোমার মোটরবাইক, আর কোথায় ষাঁড়? এদিকে সব্বোনাশ হয়েছে।"

"রাখ তোর সব্বোনাশ। এদিকে কাঁচাঘুম, তায় ভোরের স্বপ্ন। এ সত্যি না হয়ে যায় না।"

"সত্যি অলরেডি হয়ে গেছে। এই এদিকে দ্যাখো। বিজ্ঞাপনটা..."

ছোট্‌কা বিজ্ঞাপনে একবার চোখ বুলিয়েই বললে, "সকলেই তো আর সুধন্য নয়। হয়তো সত্যিকারের কোনও প্রাইভেট ডিকেটিভ..."

"ফোন নম্বরটা দ্যাখো!"

"অ্যাঁ? এ কী রে! এ তো আমাদের নম্বর..."

বিল্টু ফিসফিস করে ভোরের ঘটা কাণ্ডর কথা সব খুলে বলে বলল, "সুধন্যদা আসছে। এবার কী হবে?"

বাইরের বারান্দায় বাবার ভারী গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, "এ কী? রিসিভারটা পাশে নামানো কেন? কারও কি ফোন এসেছে? হ্যালো...হ্যালো... যাঃ, এ তো এনগেজড টোন আসছে!"

রিসিভার ক্রেড্‌লে নামিয়ে রাখার শব্দ। এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে রিনটিনটিন করে বাজল টেলিফোনটা। আবার বাবার গলা, "হ্যালো!"

"..."

"আরে না, না। পিন পয়েন্ট-টয়েন্ট নয়, এটা বি· বি· মুখার্জির বাড়ি।

"..."

"অ্যাঁ! কী বললেন? ...মিঃ এক্স?"

ছোট্‌কা একলাফে বাবার কাছে গিয়ে বলল, "আমি দেখছি। দাও!" বলে রিসিভারটা হাতে নিল। বাবা সরু চোখে ছোট্‌কার দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন, "হুম্। পিন পয়েন্ট! মিঃ এক্স!"

বিল্টু দরজায় দাঁড়িয়ে। ছোট্‌কা বলল, "হ্যালো!"

"..."

"হ্যাঁ। রহস্যর ব্যাপারে রহস্য থাকবে না?"

"..."

"শার্প অ্যাট টেন। পূর্ণ সিনেমার সামনের গাড়িবারান্দার তলায়। সিগারেট ধরাবার সময় হাতের দেশলাইটা মাটিতে ফেলবেন। আমি চিনে নেব।"

"..."

"সিগারেট খান না? বিশেষ কোনও চিহ্ন আছে?"

"..."

"হাতে হলদে রঙের রুমাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আচ্ছা, আমি লাল শার্ট, সাদা প্যান্ট, কালো শু পরে যাচ্ছি। থ্যাঙ্ক ইউ।"

রিসিভার নামিয়ে রাখার পর বাবা চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, "এসব আবার কী নতুন ইয়ার্কি ছোট্‌কু?"

ছোট্‌কা কাষ্ঠহাসি হাসল। বাবা বাথরুমের দিকে চলে গেলেন।

সুধন্যদা ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়িতে ঢুকল ঠিক আটটা চল্লিশে।

তিনটে করে সিঁড়ি লাফাতে লাফাতে ওপরে উঠেই ছোট্‌কার পা জড়িয়ে ধরে বলল, "বাঁচাও ছোট্‌কা। কেসটা যে এদিকে টার্ন নেবে ভাবিনি।"

ছোট্‌কা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে সুধন্যদার মাথায় হাত রেখে বলল, "স্থির হও বৎস। ফার্স্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি।"

ঠিক সাড়ে ন'টার সময় তসরের কাজ করা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে ঘরে ঢুকল ছোট্‌কা। বিল্টু অবাক চোখে বলল, "লাল শার্ট, সাদা প্যান্ট, কালো শু..."

ছোট্‌কা ঠোঁট-টিপে হেসে বলল, "সাবধানের মার নেই। চল্ সুধন্য।"

"দাঁড়াও, মালকোঁচাটা মেরে নিই, খুনি-টুনিদের ব্যাপার!"

মালকোঁচা মেরে, সুধন্যদা কাঁধের মাস্‌ল, আর হাতের বাইসেপ ফুলিয়ে ঝাঁকি দিয়ে বলল, "আমি রেডি।"

বিল্টু বলল, "আমি যাব না ছোট্‌কা?"

"না, তুমি বাড়িতে অপেক্ষা করবে ফোনের জন্যে। যদি ক্লায়েন্টের ফোন আসে, তবে কেসটা শুনে নিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে।"

বিল্টু একটু মনমরা হয়ে গেল। বাইরে রাস্তায় হঠাৎ দুদ্দাড় করে শব্দ। বারান্দায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখল, ঠেলা থেকে বাঁশ নামছে। হঠাৎ মনে পড়ল, পরশু তো মহালয়া। দুর্গাপুজো এসে গেছে।

ছোট্‌কা রাস্তায় বেরিয়েই সুধন্যকে বলল, "শোন্! আমরা পূর্ণ সিনেমার উলটো দিকের ফুটপাথে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আগে কেস্‌টা ওয়াচ্ করব।"

"এইবার বুঝতে পারছ যে, অন্তত আত্মরক্ষার খাতিরেও একটা রিভলভারের কী ভীষণ দরকার?"

"কিন্তু মাখনদাকে সেটা বোঝাতে, যে কী ভীষণ আত্মরক্ষার প্রয়োজন, সেটা কি তুই বুঝেছিস্? যাক্‌গে, এখন কনসেনট্রেট কর্।"

রূপচাঁদ মুখার্জি লেন দিয়ে আশুতোষ মুখার্জি রোডে পড়ে ওরা একটা রেস্টুরেন্টের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হল। তারপর ধীরে-ধীরে এসে দাঁড়াল দাঁতের ডাক্তারের দোকানের সামনে। সামনেই পূর্ণ সিনেমা। দশটা বাজতে দু'মিনিট বাকি। ঝকঝক করছে সকাল। হাওয়ায় পুজো-পুজো গন্ধ। ছুটির দিনে পুজোর বাজার করতে এর মধ্যেই একগাদা লোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। সুধন্য দার্শনিকের মতো মুখ করে বললে, "ভাবতে পারো! ঠিক পায়ের চল্লিশ ফুট নিচু দিয়ে কয়েক মাইল লম্বা টানেল, তাতে অজগর সাপের মতো পাতাল-রেল চলছে! ওপরে কোনও চিহ্ন নেই!"

"হুঁ! ক্রিমিনালের মনেও এরকম হাজার মাইল লম্বা গোপন সব টানেল আছে। ওপরে কোনও চিহ্ন নেই। দিব্যি হাসিখুশি ভদ্রলোক সব।"

ডানপাশে চড়কডাঙার মোড়ে একটা সাদা মারুতি এসে থামল। একজন টাকমাথা ভদ্রলোক একটা অদ্ভুত হলুদ রুমাল হাতে নামলেন। নেমে টাকটা রুমালে মুছে নিয়ে, মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা, লম্বা-চওড়া চেহারার টেরিকটনের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা তিনজন অবাঙালি চেহারার মানুষের দিকে তাকিয়ে কী একটা ইশারা করে রাস্তা পার হয়ে হাতে হলদে রুমাল নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে পূর্ণ সিনেমার দিকে চললেন।

ছোট্‌কা ফিসফিস করে বলল, "পুলিশের লোক। দাঁড়া, শিওর হয়ে নিই।" বলেই ডান দিকের রাস্তায় ঘুরে দেখে এসে বলল, "ওই মোড়ে পুলিশের জিপ্ অপেক্ষা করছে। আর ওই তিনজন প্লেন ড্রেসে পুলিশের কনস্টেবল। চল্, কেটে পড়া যাক্।"

কিন্তু 'কেটে পড়া যাক্' বললেই কেটে পড়া যায় না। ঠিক পৌনে এগারোটার সময় ছোট্‌কার ঘরে বসে তিনজনে আলোচনা হচ্ছিল। এমন সময় হিরুদা ঘরে এসে বলল, "বড়বাবু সবাইকে নীচে ডাকছেন। জরুরি তলব।"

বিল্টু ওদের পেছন পেছন নীচে বাবার বৈঠকখানা ঘরের সামনে আসতেই দেখল, ছোট্‌কা আর সুধন্যদার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ডানপাশে সদর রাস্তায় একটা সাদা মারুতি দাঁড়িয়ে। ছোট্‌কা নিচু হয়ে কী একটা কুড়িয়ে নিল। বাবার গলা পাওয়া গেল। "ছেলেমানুষদের কাণ্ড! ব্যাপারটাকে আপনারা গুরুত্ব দেবেন না।"

সুধন্যদা ফিসফিস করে বলল, "ছোট্‌কা, পুলিশ! আর সেই টাকমাথা ভদ্রলোক।"

ওরা ঘরে ঢুকতেই দেখল, একজন পুলিশ ইনসপেক্টর ও সেই

ভদ্রলোক। ইন্‌সপেক্টর গম্ভীর গলায় বললেন, "আপনাদের মধ্যে মিঃ এক্স কে ?"

ছোট্‌কা অকম্পিত গলায় উত্তর দিল, "আমি। আর ইনি ছিদ্রান্বেষী সুধন্য।" তারপর একটু উসখুস করে ওঠা টাকমাথা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, "নমস্কার, বিকাশকান্তিবাবু। আপনি গিরিশ মুখার্জি রোডের মুখে পুলিশ দাঁড় করিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন কেন ? পুলিশের নির্দেশেই কি ? নয়তো ওখানেই আপনার সঙ্গে কথা হত। সিগারেট খান না, নস্যি তো নেন।"

"কী করে জানলেন ?"

"যখন হলদে রুমাল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে রাস্তা পার হলেন, তখন নস্যির দাগ দেখেছি। নাকের ডগায় খানিকটা লেগেও আছে। আর আপনি কিউরিও সংগ্রহ করতেও তো খুব ভালবাসেন।"

"আশ্চর্য। আপনি কী করে জানলেন ? ওটি আমার ব্যবসা। নেশাও বটে।"

"প্রথমত, নস্যির কৌটোটা আমি দরজার কাছে কুড়িয়ে পেয়েছি। ওটা জেড্ পাথরের। সম্ভবত নবাবি আমলের।"

"হ্যাঁ। ওটা সিরাজদ্দৌলার সিপাহ্‌সালারের নস্যির কৌটো। পোর্তুগিজ জলদস্যুদের কাছ থেকে কেনা।"

"দ্বিতীয়ত, আপনার হাতের হাতির দাঁতের ছড়িটি অষ্টাদশ শতাব্দীর।"

"কারেক্ট। থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ এক্স।" বলেই বিকাশকান্তি ইনস্‌পেক্টরের দিকে ফিরে বললেন, "আমি কেস্ উইথড্র করে নিলাম। মিঃ এক্সের অবজারভেশন নিখুঁত।"

"কিন্তু আমাদের উপায় নেই বিকাশবাবু। ওঁরা ফার্ম রেজিস্ট্রেশন করেননি।"

হঠাৎ বি· বি· মুখার্জি চকচকে চোখে বললেন, "আমি গ্যারেন্টর থাকছি। কালকেই রেজিস্ট্রেশন হবে।"

"রেজিস্ট্রেশনের আগে কোনও কেস হ্যাণ্ডেল্ করবেন না। সেটা বেআইনি। পত্র-পত্রিকায় পুলিশের ওপর টেক্কা মারা গুচ্ছের শখের গোয়েন্দার গল্প বেরোয়, কিন্তু সেটা গল্পই। মনে রাখবেন, গোয়েন্দাগিরি করার জন্যেও রেজিস্ট্রেশন দরকার হয়। কারণ তাতে ক্লায়েন্টের অনেক ঝুঁকি থাকে, মিঃ এক্স! আমার নাম সুখেন বটব্যাল। যে-কোনও প্রয়োজনে আমার সঙ্গে লালবাজারে যোগাযোগ করবেন। ডি· ডি· ডিপার্টমেন্ট। ও, আপনার নাম ?"

"হিরণ্যগর্ভ মুখার্জি। আর ইনি সুধন্য চ্যাটার্জি।"

"নমস্কার।" বলে হাতে হাত মিলিয়ে সুখেনবাবু পুলিশের জিপে উঠে চলে গেলেন।

সেদিকে তাকিয়ে বিকাশকান্তি বললেন, "আরে, ভাব করছে যেন সবজান্তা। কোনও অবজারভেশন নেই, গাড়িটা পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে পারে না, আর আমাকে চোরের বদলে ডিটেকটিভ ধরতে পাঠাচ্ছে। আর এদিকে আমার দশ হাজার টাকার দফা গয়া..."

সুধন্যদা হঠাৎ গম্ভীর মুখে বলল, "বলুন, আপনার কেস্‌টা শুনি, ধনাকাকা!"

ব্যারিস্টার বি· বি· মুখার্জি ওরফে বিল্টুর বাবা চুরুট ধরাতে গিয়ে বিষম খেলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে হাসি চাপতে চাপতে নিজেরই চেম্বার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

বিকাশকান্তির বাড়িতে ঘটা ঘটনার সারমর্ম হচ্ছে, গত পরশু সকালে ওরই একজন পুরনো ক্লায়েন্ট, তিন ইঞ্চি লম্বা গোমেদের তৈরি অপূর্ব সুন্দর একটি নৃত্যরত গণেশের মূর্তি নিয়ে আসে। সেটা এক লক্ষ টাকায় রফা হয়। বিকাশকান্তির কাছে অত টাকা না থাকায়, পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে একটা বায়নানামা করে লোকটি চলে যায়। লোকটি অবস্থা পড়ে-যাওয়া অতি প্রাচীন বনেদি বাড়ির সন্তান। সে তার বাড়ির কিউরিও বিক্রি করেই দিন চালায়। এর আগেও অনেক জিনিস বিক্রি করেছে, তাই বিকাশকান্তির কোনও সন্দেহ হয়নি। মূর্তিটা ভল্টে তুলে রাখার আধঘণ্টা বাদে দু'জন ভদ্রলোক আসেন। একজন তামাটে ফর্সা, কটা চোখ, কটা চুল, অন্যজন শ্যামবর্ণ। তাঁরা বিকাশকান্তিকে বলেন যে, মূর্তিটা ফেরত দিতে হবে। বিকাশকান্তি অস্বীকার করলে ওঁরা বলেন, তা হলে পুলিশ নিয়েই আসবেন, কারণ ওটা চোরাই মাল। ভল্ট সার্চ হবে। বি· কে· দোনামোনা করে, সেই লোকটির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাকে পাওয়া যায় না। বায়নার পাঁচ হাজার পেয়ে সে তখন উড়ে গেছে। সেই ভদ্রলোকেরা বলেন, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে মূর্তি না দিলে তাঁরা লালবাজারে জানাবেন। সুতরাং ভয়ে-ভয়ে বিকাশকান্তি ওঁদের মূর্তি দিয়ে দেন। টেবিল থেকে একজন রুমাল মুড়ে মূর্তিটা তুলে নিয়ে বলেন যে, ওঁদের যদি এখন যদি এখন দশ হাজার টাকা না দেওয়া হয়, তা হলেও চোরাই মাল কেনার দায়ে বিকাশকান্তিকে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন। কারণ মূর্তিতে বিকাশবাবুর আঙুলের ছাপ আছে। ভয়ে-ভয়ে বিকাশবাবু ওদের মুখ বন্ধ করার জন্যে ভাগনের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা এনে ওঁদের হাতে তুলে দেন। বাকি পাঁচ হাজার টাকা পরের দিন সন্ধেয় শশিভূষণ দে স্ট্রিটের এক ঠিকানায় পৌঁছে দেবার কথা হয়। পরের দিন দুপুরে সেই মূর্তি বিক্রি করতে আসা পড়ন্ত-বনেদিবাড়ির লোকটি আসে। এসে বলে যে, যাক্, কাল জুয়ো খেলে সে দশ হাজার রোজগার করেছে। তাই ওই মূর্তি সে বেচবে না। "এই আপনার পাঁচ হাজার নিন, আমায় গণেশ ফেরত দিন।" বিকাশবাবুর আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশে ফোন করেন। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝতে পারে, লোকটি সত্যি বলছে, গণেশটি তারই বংশের সম্পত্তি। শশিভূষণ দে স্ট্রিটের ঠিকানাটা ভুয়ো। সেখানে একটি কয়লার দোকান। চারপাশে বস্তি। দশ হাজার গেছে, এখন গণেশের দাম হিসেবে পঁচানব্বই হাজার দিতে হবে।

সমস্ত শুনে ছোট্‌কা বলল, "কাল বিকেলে আপনার ওখানে যাব। কাল ফার্মের রেজিস্ট্রেশন হোক। আমরা সারাটা রাত ভাবি। ধন্যবাদ।"

সকালবেলাই বাবা লোক পাঠিয়ে ফর্ম আনালেন। কিন্তু সরকারি আইনের বেড়াজালে পড়ে রেজিস্ট্রেশন হতে-হতে বেলা তিনটে বেজে গেল। ফিরে এসে ছোট্‌কা সবুজ রঙের কর্ডের প্যান্ট আর হলুদ জামা পরে নতুন কেনা লাল-হলুদ সুজুকি মোটর সাইকেলের পেছনে সুধন্যদাকে বসিয়ে হুশ্ করে বেরিয়ে গেল। সুধন্যদার পরনে পাজামা আর আদ্দির পাঞ্জাবি। কিন্তু মুখটা ব্যাজার, কারণ মোটরসাইকেলের পেছনে বসলে হাওয়ায় ওর চুল নষ্ট হয়ে যায়।

রাত আটটা নাগাদ ওরা ফিরল। ফিরেই সুধন্যদা বাড়িতে ফোন করল যে, আজ ফিরবে না। তারপর ঘরে ঢুকে বলল, "হ্যাঁ, দিল আছে বিকাশবাবুর! খাওয়ালেন বটে একটা খাঁটি। গরম গরম মাছের কচুরি, আর সাদা কাশ্মিরি আলুর দম। সঙ্গে কেষ্টনগরের সরভাজা। আঃ!"

ঠিক ভোর চারটেয় অ্যালার্ম দেওয়া ছিল। রেডিওতে তিনজনে মহালয়া শোনার পর চা-জলখাবার খেয়ে ওরা রেডি হয়ে নিল। ছোট্‌কা গ্যারাজ থেকে পুরনো হিল্‌ম্যান গাড়িটা বের করছে। সুধন্যদা উত্তেজনায় গান গাইছিল, 'জাগো দুর্গা, জাগো

দশপ্রহরণধারিণী/ অভয়া শক্তির বলপ্রদায়িনী তুমি জাগো।'

বৈঠকখানায় বাবার বন্ধু অমলেশবাবু এসেছেন। ফ্রেঞ্চ টোস্ট খেতে-খেতে দাবা খেলছেন দু'জনে। বিল্টু সাবধানে দরজা পার হচ্ছিল, তবু বাবার চোখে পড়ে গেল। "খুব সাবধানে কিন্তু! ক্রিমিনালরা ন্যায়নীতির ধার ধারে না!"

সুধন্যদা গুম হয়ে বসে ছিল। গাড়ি সার্কুলার রোডে পড়তেই বলল, "ওদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র মানে পিস্তল বা রিভলভার থাকতে পারে?"

ছোট্‌কা গম্ভীর মুখে গাড়ি টার্ন করিয়ে বলল, "পারে।"

"তা হলে এক চড় মেরে প্রথমেই রিভলভারটা কেড়ে নেব। পিন পয়েন্টের একটা তো অন্তত হবে।"

"আমাদের কারও তো লাইসেন্স নেই। সেটা আরও বেআইনি হবে।"

"দুত্তোর! চারদিকে শুধু আইন আর আইন।"

বিল্টু হাসিমুখে বলল, "আইন ভাঙলেই ফাইন।"

শশিভূষণ দে স্ট্রিটের সেই নম্বরের বাড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। একটা বিশাল বস্তি। সামনের বারোয়ারি কলে জল পড়ছে। টালি আর খাপরার চালের ঘর। শিশি-বোতল, পুরনো খবরের কাগজ বিক্রির দোকান, রাং-ঝালের দোকান। পাহাড়-প্রমাণ পুরনো বাটখারা সাজানো। একটা দোকানে পুরনো রেনওয়াটার পাইপ, কলের পাইপ কেনাবেচা হচ্ছে। তিনজনে গুটিগুটি সেই নম্বরের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। একটা বিশাল কালিঝুলি মাখা কাঠের পাটাতনের দাঁড়িপাল্লা খাটানো। পাশে কয়লার স্তূপ। সারা গায়ে উল্কি কাটা, রুপোর গয়না পরা এক মাঝবয়সী দশাসই মহিলা দোকানের ছোকরা-কুলিকে বেদম ধমকাচ্ছে।

ছোট্‌কা গম্ভীর মুখে বলল, "এ চাচি, এখানে একজন কটা-চোখ, কটা-চুলের লোক আসে? ওর দু-তিনজন বন্ধু আছে।"

মহিলা সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললেন, "হামি কুছু জানে না।"

সেই ছোকরা-কুলিটি ফিক করে হেসে বাংলায় বলল, "পুলিশ থেকে আসছেন?"

সুধন্যদা গম্ভীর গলায় বলল, "না। আমরা প্রাইভেট ডিটে··· উফ্, গেছি, গেছি! আমার পা মাড়িয়ে দিলে কেন ছোট্‌কা?"

ছোট্‌কা ছুরির মতো চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "সরি। দেখতে পাইনি।"

মহিলার কয়লার মতো কালো চোখ অত্যন্ত সাবধানি। বললেন, "এই দুকানে কোই কটা আদমি নেহি হ্যায়। আপকো কিতনা কোইলা চাই? কাম কা বাত্ বলিয়ে।"

গম্ভীর মুখে ওখান থেকে পিছু হটল ছোট্‌কা। তারপর গলি দিয়ে ফিরে মোড়ের কাছে এসে পুরনো খবরের কাগজের দোকানের আড়ালে ওদের দু'জনকে টেনে একটু লুকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পিঠে কয়লা নিয়ে সেই ছেলেটি আসছে। বাঁকের ঠিক মুখে ওর পাশে-পাশে হাঁটতে লাগল ছোট্‌কা। বলল, "আমরা পুলিশের লোক নই। আমাদের অনেক টাকা চিটিং হয়ে গেছে।"

পিঠে কয়লার বস্তা। গায়ে ঘামে-ভেজা জালি-গেঞ্জি। কালিমাখা মুখে দাঁতগুলো মুক্তোর মতো ঝকঝক করছে। ওর বুকের কাছে ছেঁড়া গেঞ্জির ফাঁকে একটা দশ টাকার নোট ঢুকিয়ে দিল ছোট্‌কা। ছেলেটি হাঁটতে হাঁটতেই বলল, "ব্যাটা আমাকে এক ঝাপ্পড় মেরেছিল। টাকাটা লিয়ে লিন। গ্র্যান্ট ইস্ট্রিটে সুটকেসের দুকানের ইধার-উধার পাত্তা লাগান। ধরতে পারলে আমার হয়ে এক ঝাপ্পড় কষাবেন।"

ছোট্‌কা হাসিমুখে বলল, "ভাই, অনেক ধন্যবাদ। তুমি টাকাটা দিয়ে একটা গেঞ্জি কিনো। মিঠাইও খেতে পারো। চলি।"

ছেলেটি হাসিমুখে ওদের একঝলক দেখে নিয়েই আবার কুঁজো হয়ে কয়লার বস্তা কাঁধে হাঁটতে লাগল।

হিলম্যান গাড়িটা গ্র্যান্ট স্ট্রিটের এক কোণে সাবধানে পার্ক করল ছোট্‌কা। বেলা প্রায় দশটা। শরৎকালের আকাশ নীলকান্তমণির মতো ঝলমল করছে। রাস্তার পিচ ভিজে। একটু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। যেন বেড়াতে বেরিয়েছে এরকম নিরুত্তাপভাবে ওরা তিনজন হাঁটছিল। দোকানগুলোতে বিভিন্ন ডিজাইনের পাহাড়ের মতো স্তূপাকার সুটকেস সাজানো। হঠাৎ ছোট্‌কা সুধন্যদাকে প্রশ্ন করল, "হ্যাঁ রে, বিকাশকান্তিবাবু কটা-চুল লোকটার বয়েস বলেছিল সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ না?"

"হ্যাঁ।"

সঙ্গে-সঙ্গে ছোট্‌কা পাশের একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে গেল। ঢুকে কাউন্টারের লোকটির হাতে একটা টাকা দিয়ে বলল, "একটা ফোন করব?"

"করুন।"

ও-প্রান্ত থেকে 'হ্যালো' বলতেই ছোট্‌কা বলল, "হ্যালো!··· একটু সুখেন বটব্যালকে দিন।"

দশ সেকেণ্ড বাদে ওপাশে বটব্যাল ধরলেন। ছোট্‌কা বলল, "আমি হিরণ্যগর্ভ বলছি। চিনতে পারছেন? ···বাঃ, তা হলে একটা জিপ্ নিয়ে গ্র্যান্ট স্ট্রিটে চলে আসুন।··· ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদের রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। থ্যাঙ্ক ইউ।"

বলেই রিসিভার নামিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল ছোট্‌কা।

"সুধন্য, একটু তফাতে থেকে আমায় ফলো কর। আমি আক্রান্ত হলে চার্জ করবি। বিল্টু, আমার সঙ্গে আয়। তুই থাকলে সন্দেহ কম হবে।"

পার হয়ে আসা একটা সুটকেসের দোকানের দিকে ফিরে চলল ছোট্‌কা। বিল্টু আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, সুধন্যদা গোলাপি রেউড়ির লম্বা সাদা-তিল আর চিনির লাঠি কিনছে। যেন ওদের চেনেই না।

একটা দোকানে সোজা ঢুকে গেল ছোট্‌কা। পেছন পেছন বিল্টু। দরজায় নেপালি বেয়ারাটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বোলিয়ে। বহুত আচ্ছা চিজ হ্যায়। বেক্সিন, লেদার, ফোম সবকুছ হ্যায়।··· কিত্‌না ইঞ্চি সুটকেশ?"

বিল্টু স্থির। কাউন্টারে একজন কটা-চুল, কটা-চোখ ফর্সা লোক বসে আছে। কিন্তু দেখলে মনে হয়, বয়স তেইশ-চব্বিশ, সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ নয়। ছোট্‌কা হাসিমুখে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"নমস্কার। আপনার দাদার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।"

যুবকটি ভুরু কুঁচকে তাকাল, "আমার কোনও দাদা-টাদা নেই।"

"সে কী! আপনারই মতো অনেকটা দেখতে। আমার বড়দা'র বন্ধু। আমার বাবার ডেথ ডিউটি দেবার সময় আমায় তিন হাজার টাকা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'সুবিধেমতো দোকানে ফেরত দিও।' এই দোকানটাই তো বলেছিলেন।"

বিল্টুর গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। যুবকটি অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে কেটে-কেটে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, "দাদা নয়, কাকা। তা কাকা আপনাকে টাকা ধার দিয়েছিল? আশ্চর্য! ও বাহাদুর, শোন্! কাকাও মানুষকে টাকা ধার দেয়! আশ্চর্য!"

ছোট্‌কা অকম্পিত গলায় বলল, "আপনার কাকার সঙ্গে একবার দেখা হবে না? টাকাটা নিয়ে এসেছিলাম।"

"বাহাদুর! দ্যাখ তো একবার নিতাইয়ের চায়ের দোকানের ঝাঁপের

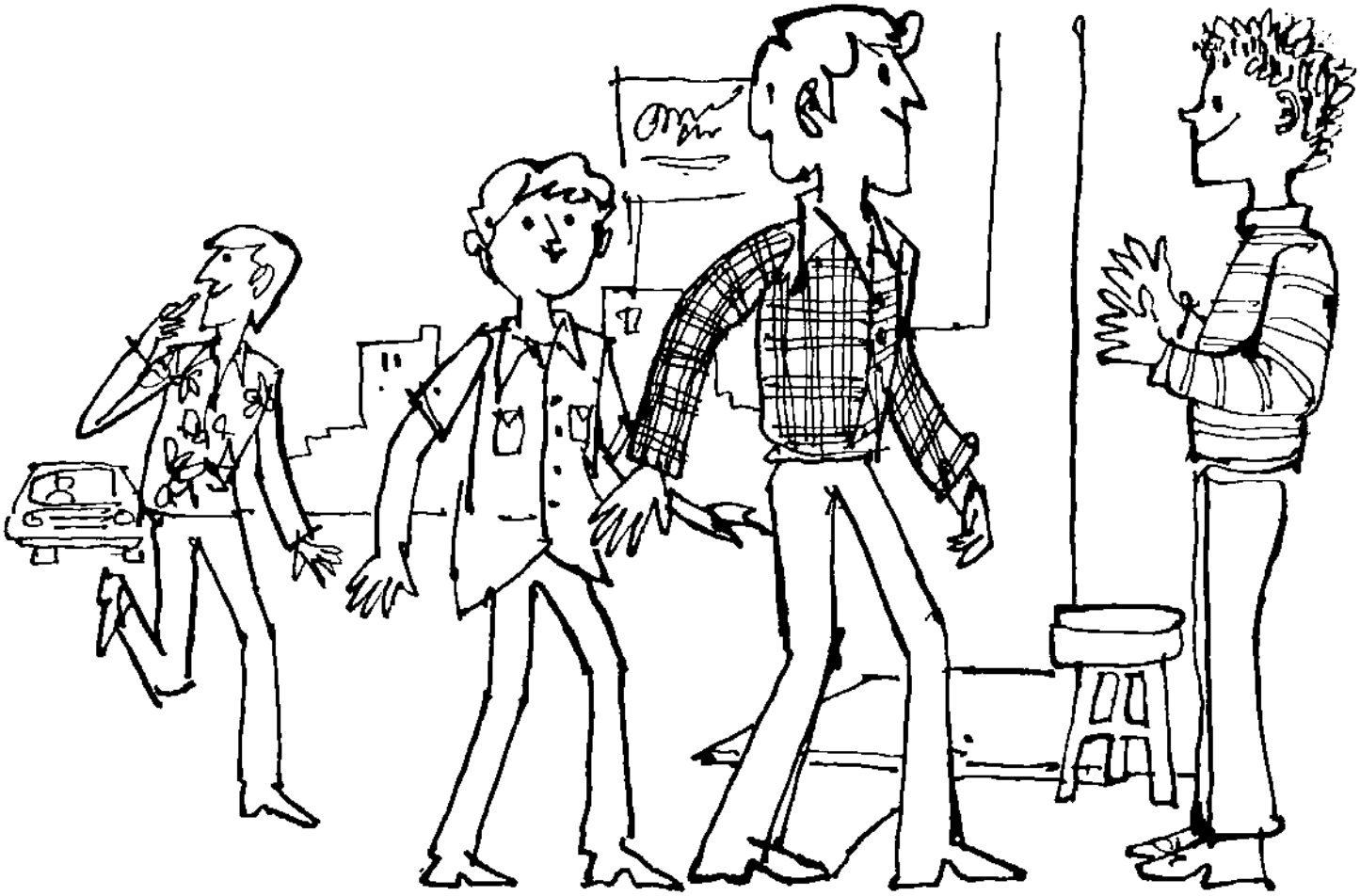

পেছনে। যান, ওর সঙ্গে যান। তবে শুনে যান, আমার কাকাকে আমি এই দোকানে ঢুকতে দিই না। আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক। আমার কাকার সঙ্গে বেশি দহরম-মহরম করবেন না। হাতে হাতকড়া পড়বে।"

একটা নিশ্বাস ফেলে ছোট্‌কা আর বিল্টু দোকান থেকে বেরিয়ে এল।

গ্র্যান্ট স্ট্রিটের একেবারে শেষ প্রান্তে নিতাইয়ের চায়ের দোকান। একটা বাড়ির গ্যারাজের অর্ধেকটা পার্টিশান দেওয়া। রাস্তার চায়ের দোকান যে-রকম হয় আর কি। লুঙ্গি ভাঁজ করে কোমরে বেঁধে একটা লোক চা বানাচ্ছে। বেঞ্চিতে বসে বিভিন্ন ধরনের লোক চা খাচ্ছে। ওখানে কোনও কটা-চুল লোক নেই। বিল্টু আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, সুধন্যদা কামড়ে কামড়ে রেউড়ির লাঠি খেতে-খেতে আনমনে আসছে।

বাহাদুর গিয়ে নিতাইয়ের কানে-কানে কিছু বলতেই বিরক্ত মুখে নিতাই চায়ের দোকানের পেছনের চাটাইয়ের পার্টিশান সরিয়ে উঁকি দিল। পিছনে ছোট ঘর। তাস খেলা হচ্ছে। মাটিতে-মাদুরে টাকাপয়সা ছড়ানো। চাটাইয়ের তলা দিয়ে কুঁজো হয়ে একজন ফর্সা লোক বেরিয়ে এল। কটা-চুল। কটা-চোখ। এগিয়ে এসে প্রচণ্ড বিরক্তিতে ছোট্‌কাকে বলল, "কী ব্যাপার? কী চাই?"

ছোট্‌কা হাসিমুখে বলল, "পাঁচ হাজার টাকা আর ওই ছোট্ট গণেশের মূর্তিটা।"

সঙ্গে-সঙ্গে একটা খারাপ গালাগালি দিয়ে একটা চড় মারল গাঁট্টাগোট্টা লোকটা। ছোট্‌কা কাত হয়ে পড়ে যেতে যেতে একটা ল্যাং মারল। লোকটা চিত হয়ে পড়ল সুধন্যদার বাড়ানো দু'হাতের মধ্যে। সুধন্যদা ক্যারাটের ভঙ্গিতে হাসিমুখে চেটোর কোনা দিয়ে ঠেসে ওর ঘাড়ে মেরে বলল, "একে বলে রদ্দা।" তারপর শূন্যে তুলে একপাক ঘুরিয়ে লোকটাকে ফুটপাথে আছড়ে দিয়ে বলল, "আর একে বলে ধোবি পাট। বুঝলি বিল্টু, ধোপারা এরকম করে মাথার ওপর ঘুরিয়ে আছাড় মেরে কাপড় কাচে। দরোয়ান রামবিলাসের কাছে এই প্যাঁচটা শিখেছি। যাঃ! গোলাপি রেউড়িটা মাটিতে পড়ে গেল! অ বিল্টু! ওর পকেট হাতড়ে দ্যাখ্ না, কোম্পানির জন্যে একটা রিভলভার পাওয়া যায় কি না?"

বিল্টু হাসতে-হাসতে বলল, "আমি পকেটমার নই।"

ফুটপাথে ভিড়ে ভিড়াক্কার। তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই মিঃ বটব্যাল জিপ নিয়ে কোঁয়া-কোঁয়া করতে-করতে ওখানে পৌঁছে গেলেন। সুধন্যদা আর ছোট্‌কা পাঁজাকোলা করে কটা-চুলোকে, বটব্যালের জিপে তুলে দিয়ে বলল, "এই নিন আপনার কালপ্রিট। আমরা ধরে দিলাম। এবার রুলের গুঁতো দিয়ে টাকা আর গণেশমূর্তি বার করুন।"

বটব্যাল চকিত চাউনিতে বললেন, "এ কী! আপনার ঠোঁটটা ফেটে গেছে যে!"

বিল্টু হাসিমুখে বলল, "ক্রিমিনালরা ন্যায়নীতির ধার ধারে না।"

ষষ্ঠীর দিন রেজিস্টি ডাকে, বি· কে·'র কাছ থেকে ৫০০১ টাকার একটা চেক এল। চেকটা হাতে নিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে সুধন্যদা বলল, "এখন এটা ভাঙাব কী করে? পিন পয়েন্টের নামে তো কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই। নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে আবার ৫০ টাক লাগবে। সেটা দেবে কে?"

দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে শিবরামদাদু বললেন, "আমি দেব। জিতা রও বাচ্চা।"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

অ্যাস্ট্রো-স্কুলের

সিদ্ধার্থ ঘোষ

ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের অফিসার কম্পিউটার থেকে নীল কার্ডটা টেনে নিয়ে সুদীপের দিকে এগিয়ে দিলেন। পাশপোর্ট সাইজের ফোটোগ্রাফের ডান দিকে নাম-ঠিকানার নীচে সুদীপের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। অ্যাস্ট্রো-স্কুলের ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্টের প্রি-টেস্টের প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরির জন্য এক্সপিডিশানে বেরনোর স্পেশাল পারমিট।

ম্যাপ খুললেই দেখা যাবে, সৈকত থেকে আন্দাজ পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে একটা খালের ধারে সমুদ্রমুখ গ্রামে এসে পাকা রাস্তাটার উপর ফুলস্টপ পড়েছে। কিন্তু সুদীপকে থামতে হল আরও তেতাল্লিশ কিলোমিটার আগে। তাতে অবশ্য সে খুশিই হয়েছে। এক বছর অন্তর কার্টোগ্রাফাররা আসে নতুন ম্যাপ বানাতে। কিন্তু তার জন্য প্রকৃতিদেব তো আর অপেক্ষা করে বসে নেই।

সুদীপের লগ-বুকে প্রথম এন্ট্রি : আঞ্চলিক চেহারায় পরিবর্তনের হিসেব। পথ অনেকটা বেড়ে গেল জেনেও সুদীপ ঘন্টাখানেক খরচ করল মাপজোক সারতে। হয়তো দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত এটাই হবে তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার।

কিন্তু এক্সাইটমেন্টের মুখে একটা ভুল করেছে। ইন্সট্রাকশন ম্যানুয়েলে লেখা আছে গাড়ি চলার রাস্তা শেষ হলেই নিরাপদ জায়গা খুঁজে বার করে মিনি ট্রাক পার্ক করার ব্যবস্থা করতে হবে।

অবশ্য সমুদ্রমুখে তিন ঘর লোক আর একটা পুলিশথানা আছে ভেবেই গাড়ি পার্কিং-এর কথা লেখা হয়েছিল। এই পরিত্যক্ত গ্রামে গাড়ি ফেলে যেতে হবে ভেবে নাভার্স লাগে সুদীপের। কাজ সেরে ফিরতে চোদ্দ-পনেরো ঘন্টা তো লাগবেই। চুরির আশঙ্কাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় কি ? গাড়ি চুরি হলে ফেরার সময় কতটা পথ হাঁটতে হবে, তার চেয়েও বড় চিন্তা গাড়িটা ইন্সিওর করা নেই। সোলারকার-মার্ক সিক্সের চেয়ে পুরনো কোনও মডেল ইন্সিওর করা যায় না। সুদীপের তিন বছরের পুরনো এই গাড়িটা ভিন্টেজ মডেল হতে পারে, কিন্তু সে শুধু চেহারায়। তার বাবা যেভাবে মেন্টেন করেন তাতে—গাড়ি চুরি হলে সবচেয়ে অসুবিধেয় পড়বে বাবা।

ফাইবার গ্লাস-ব্রিকের আবর্জনার মধ্যে একটা ভাঙা দেওয়ালের পাশে তিনটে তোবড়ানো গাড়ি তিন দিকে মুখ ফিরিয়ে পড়ে আছে। যেন প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আড়ি। এককালে এখানে বোধহয় গ্যারেজ ছিল। হোভারক্র্যাফটটা নামিয়ে নিয়ে মিনি-ট্রাকটাকে ভাঙা গাড়িগুলোর মধ্যেই এক ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। একটা চাকা রিমসুদ্ধু খুলে তুলে নিল হোভারক্র্যাফটে। তাতেও মন ভরল না। বাকি চাকা ক'টার হাওয়া বার করে দিল।

পিছন থেকে মোটা গলায় 'কে' 'কে' ডাক শুনে চমকে গেল সুদীপ। মুখ ফিরিয়েও কাউকে দেখতে পেল না। এখানে যদি লোকজন থাকে, যদি লুকিয়ে তার ওপর নজর রাখে, তা হলে তো এ সবই পণ্ডশ্রম। সুদীপকে আর ভাববার সুযোগ না দিয়ে কে-কে ডাকটা তারই সামনে উড়ে এল।

দাঁড়কাকটাকে দেখে বিশ্রী লাগে সুদীপের। এমন পালক-খসা শির বার-করা পাখি কখনও দ্যাখেনি। সন্তর্পণে পায়ে-পায়ে হেঁটে এগিয়ে এল হোভারক্র্যাফটের কাছে। সুদীপ চায় না কাকটা পালাক। হ্যাচ খুলে ড্রাইফুডের পলিথিন-প্যাক থেকে চিকেন বিস্কুট বার করেছে। অকারণেই সতর্ক হয়েছিল সুদীপ। খিদের চোটে কাকটা মানুষকেও আর তেমন ভয় পাচ্ছে না। ভাল করে বোধহয় ওড়ারও ক্ষমতা নেই। অসুস্থ কাকটা তুড়ুক-তুড়ুক পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল খাবারের গন্ধে। সুদীপ কাঁধের ব্যাগ থেকে মিনি গাইগারকাউন্টার বার করল। তার সন্দেহই ঠিক। কাকটা তেজস্ক্রিয়তার শিকার। তবে মিটারের

হিসেব অনুসারে সেটা বিপদসীমার নীচে। এবার বুঝতে পারছে এ-অঞ্চলের কেন এই অবস্থা।

ধারে-পাশেই নিশ্চয় কোথাও বেআইনি ভাবে গোপনে পারমাণবিক শক্তিচালিত রকেট নিক্ষেপের পরীক্ষা চালানো হয়েছে। তিন বছরে ন-ন'টা পারমাণবিক রকেট ব্যর্থ হওয়ার পর আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্থা এই পরীক্ষা অমানবিক ঘোষণা করেছে। তা বলে সেই নিষেধ পুরোপুরি মানা হচ্ছে ভাবার কারণ নেই। এই নিয়ে কয়েকটা রিপোর্ট তো খবরের কাগজেও ছাপা হয়েছে।

কাকটার কয়েকটা রেডিয়েশন ফোটোগ্রাফ তুলল সুদীপ। প্রমাণ। তারপর স্যাম্পেল ব্যাগে ভরে নিল কিছুটা মাটি। হোভারক্র্যাফট নিয়ে অনুসন্ধানে বেরোলে হয়তো অ্যাটমিক রকেট নিক্ষেপের লঞ্চিং প্যাডটার হদিস মিলতে পারত। কারণ যতই সেদিকে এগনো যাবে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা বাড়বে আর গাইগারের কাঁটা টিকটিক শব্দ তুলে হেলতে থাকবে।

দু' হাতে হোভারক্র্যাফটের মাথায় কচ্ছপের খোলের মতো স্বচ্ছ ফাইবার গ্লাসের ঢাকনি তুলে মুখ ঢুকিয়ে ড্যাশবোর্ডের দিকে তাকাল সুদীপ। না, সম্ভব নয়। এক সপ্তাহ ধরে টানা চার্জে রাখার পরেও ব্যাটারির মতিগতি ভাল ঠেকছে না। কিছুটা রাস্তা ডিজেল ইঞ্জিনের ওপর ভরসা করতেই হবে। তারপরে সোলার ইঞ্জিনে সুইচ ওভার। চার ঘন্টার মতো পথ চলার ডিজেল সংগ্রহ করতেই প্রায় ফতুর হয়ে গেছে। সত্যি বলতে, এইজন্যেই মিনি ট্রাকের পিঠে তুলে এতদূর বয়ে আনতে হয়েছে হোভারক্র্যাফটটাকে। না হলে জোকা থেকেই সোজা হোভারক্র্যাফটে চড়ে পাড়ি দিতে পারত।

কাকটা বিরক্তিকরভাবে ভাঙা গলায় এখনও ডাকাডাকি করছে

ছাত্র

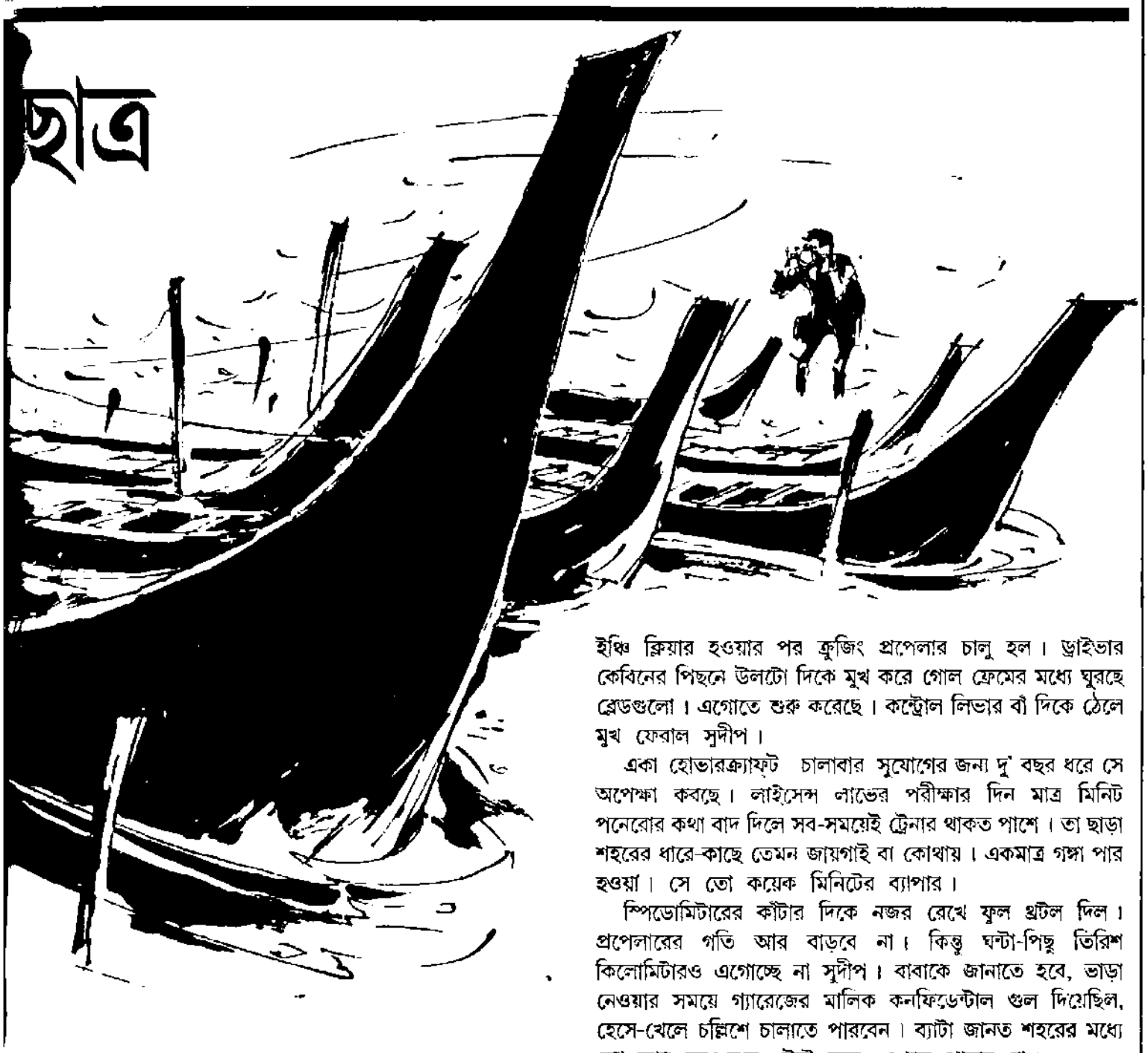

সুদীপ পুরো বিস্কুটের প্যাকেটটাই উপুড় করে দিল।

এখন মনে হচ্ছে, ট্রাকের চাকাটাকা খোলাখুলি করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। এই বিপজ্জনক জনশূন্য এলাকায় কোনও গাড়ি আসারই সম্ভাবনা নেই, তো তা আর চুরি করবে কে।

হোভারক্র্যাফ্টের ডান দিকের গায়ে লাগানো আংটায় পা রেখে হুড তুলে ড্রাইভারের সিটে এসে বসল সুদীপ। সেল্‌ফ স্টার্টারে হাত দেওয়ার আগে চেক করে নিল, স্লিপিং ব্যাগ, হ্যাভারস্যাক আর জলের ক্যান্টিন। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে নড়েচড়ে বসল। পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে।

ডিজেল ইঞ্জিনটা গরগর করছে। আশা আছে, ঘন্টাখানেক চললেই ব্যাটারি চার্জ হয়ে যাবে। হোক বা না হোক, সে দেখা যাবে। শুধু ব্রেকডাউনের ভয়েই মাঝপথ থেকে ফিরে যাওয়ার পাত্র নয় সুদীপ।

ডিমের আকারের টু-সিটার হোভারক্র্যাফটের তলার অংশে চারদিক ঘিরে রয়েছে একটা সিন্থেটিক ঘাঘরা। হাওয়া জমে সেটা ফুলে উঠছে, আস্তে-আস্তে ভেসে উঠছে হোভারক্র্যাফ্ট। মাটি থেকে ছ' ইঞ্চি ক্লিয়ার হওয়ার পর ক্রুজিং প্রপেলার চালু হল। ড্রাইভার কেবিনের পিছনে উলটো দিকে মুখ করে গোল ফ্রেমের মধ্যে ঘুরছে ব্লেডগুলো। এগোতে শুরু করেছে। কন্ট্রোল লিভার বাঁ দিকে ঠেলে মুখ ফেরাল সুদীপ।

একা হোভারক্র্যাফ্ট চালাবার সুযোগের জন্য দু' বছর ধরে সে অপেক্ষা করছে। লাইসেন্স লাভের পরীক্ষার দিন মাত্র মিনিট পনেরোর কথা বাদ দিলে সব-সময়েই ট্রেনার থাকত পাশে। তা ছাড়া শহরের ধারে-কাছে তেমন জায়গাই বা কোথায়। একমাত্র গঙ্গা পার হওয়া। সে তো কয়েক মিনিটের ব্যাপার।

স্পিডোমিটারের কাঁটার দিকে নজর রেখে ফুল থ্রটল দিল। প্রপেলারের গতি আর বাড়বে না। কিন্তু ঘন্টা-পিছু তিরিশ কিলোমিটারও এগোচ্ছে না সুদীপ। বাবাকে জানাতে হবে, ভাড়া নেওয়ার সময়ে গ্যারেজের মালিক কনফিডেন্টাল গুল দিয়েছিল, হেসে-খেলে চল্লিশে চালাতে পারবেন। ব্যাটা জানত শহরের মধ্যে তো আর সঙ্গে-সঙ্গে টেস্ট করে দেখতে পারবে না।

বাবা বারণ করে দিয়েছিলেন বেশি গাছপালার মধ্যে যেন কেরামতি করার চেষ্টা না করে। কিন্তু আধ ঘন্টার মধ্যে গাছ দূরের কথা, বড়সড় ঝোপঝাড়েরও দেখা মেলেনি। সত্যি বলতে একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে এবার। মাঝে-মাঝেই চোখে পড়ছে সেকালের ন্যাশনাল হাইওয়ের অংশবিশেষ একেবারে লোপাট। কিন্তু মোটের ওপর রাস্তাটাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে অসুবিধে হচ্ছে না।

ডান দিকে মুখ ফেরালেও পশ্চিমের সূর্যটার আর চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। ঘড়ির দিকে তাকানোর কোনও কারণ নেই জেনেও মাঝে-মাঝে চোখ পড়ছে আর উত্তরটা মুখস্থ হয়ে গেছে, তবু হিসেব করছে পৌঁছতে ক'টা বাজবে।

কিলোমিটারের পর কিলোমিটার ঘরবাড়ি খেত-খামারের চিহ্ন নেই, মানুষজন দূরের কথা। একটা পাখির ডাক অবধি কানে আসেনি। সুদীপের সন্দেহ হল তেজস্ক্রিয়তার উৎসের দিকে এগোচ্ছে না তো? চারধারে এরকম পতিত জমি কেন? মরুভূমির মতো বালি ছড়ানো নেই, পাথুরে জমিও তো নয়। প্রথম থেকেই রেডিয়েশনের মাত্রাটা মাপতে-মাপতে এগনো উচিত ছিল।

গাইগার যন্ত্র অবশ্য আশ্বস্ত করল। বিপদের মুখে পড়ার ভয় নেই। কিন্তু তবু থামতে হল সুদীপকে। ন্যাশনাল হাইওয়ের ধ্বংসাবশেষও আর ঠাহর করা দুষ্কর। একটা ছোট্ট নদীর এপার অবধি যেটার স্পষ্ট নিদর্শন, ওপার থেকে সেটা বিলকুল বেপাত্তা।

হোভারক্র্যাফ্ট দাঁড় করিয়ে নেমে এল। বড় ম্যাপটা যদি সাহায্য করতে পারে। যদি এই নদীটাকে খুঁজে বার করা যায় তো... নাঃ। ম্যাপটা ভাঁজ করতে-করতেই নদীর উজানে বেশ কিছুটা দূরে কী যেন একটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সুদীপ মহা উৎসাহে হাত নাড়তে-নাড়তে চিৎকার জুড়ে দিল। একটা নয়, দু-দুটো লোক। খালি গা, হাঁটু-জলে দাঁড়িয়ে কী করছে ওরা?

লোক দুটো চমকে গেছে। জল ছেড়ে তীরে উঠেই দৌড় লাগিয়েছে। পালাতে চায়। সুদীপও ছুটতে শুরু করে। "শোনো, শোনো!"

পরনে নেংটির মতো একটা করে গামছা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। ভূত দেখার মতো দৌড়চ্ছে কেন? সুদীপের সঙ্গে এঁটে ওঠার আশা নেই জেনেও মরিয়া হয়ে ছুটছে। আর হাঁপাচ্ছে।

"হলটা কী? শুধু-শুধু ছুটছ কেন?" সুদীপ বলে।

শেষ পর্যন্ত একজন হার স্বীকার করে। ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে ওর দু' হাত চেপে অনুনয় জানায়, "ধরিয়ে দিও না বাবু। ধরিয়ে দিও না। কোনও উপায় থাকলে আসতুম না বাবু..."

দ্বিতীয়জন এখনও ছুটছে দেখে সুদীপ বলল, "ওকে দাঁড়াতে বলো না।"

"প্রাণের ভয় বাবু, বললেও কি শুনবে?"

"মহা মুশকিল, খালি ভয় ভয় করছ, ভয়টা কিসের? সেটা বলো।"

"পুলিশ, বাবু, পুলিশ। আর কার। বিশ্বাস করো, খিদের জ্বালায় মাছ ধরতে এসেছি। প্রায় তিন দিন পেটে কিছু পড়েনি। কমপক্ষে পাঁচ ক্রোশ হেঁটেছি আজ।"

সুদীপ অনুমান করে তেজস্ক্রিয় এই অঞ্চলে চলাফেরার ওপর নিশ্চয় নিষেধাজ্ঞা আছে। মাছ ধরা তো নিশ্চয় গর্হিত অপরাধ।

লোকটা এবার কিঞ্চিৎ সাহস পেয়েছে। জানতে চাইল, "দেখে তো পুলিশের লোক মনে হচ্ছে না। তা বাবুর কোথায় যাওয়া হবে? এই মড়ার দেশে..."

"সমুদ্রের ধারে একটা শহরে। খুব দূর নয় এখান থেকে।"

"শহরে?"

"মানে এককালে শহর ছিল। শুনেছি ছুটির দিনে বহু লোক বেড়াতে আসত।"

লোকটা এবার রীতিমত অভিভাবকের সুরে আপত্তি জানায়, "না, না। ওসব জায়গায় যেতে নেই। কেউ যায় না। এক কুড়ি বছরে কেউ পা দেয়নি।"

"কে পা দিয়েছে বা দেয়নি তাতে আমার কিছু যায় আসে না।"

"তা বলে সন্ধের মুখে যাবে? পৌঁছতে ক'টা বাজবে খেয়াল আছে? জায়গা কোথায় থাকার?"

বিরক্তি হয়ে পিছন ফেরে সুদীপ।

"শোনো বাবু, সত্যিই যেতে হয় তো সকালে যেও না হয়। আমরা পথও দেখিয়ে দেব।"

"তার দরকার নেই। পথ চেনার অসুবিধা হবে না।"

লোকটা সুদীপের হাত চেপে ধরল পিছন থেকে, "ঠিক আছে, যাবেই যদি আমাদেরও সঙ্গে নাও। একা যাওয়ার চেয়ে..."

সুদীপ হেসে ফেলল এবার। ঘাড় নেড়ে বলল, "তার তো উপায় নেই। গাড়িতে জায়গা হবে না।"

লোকটার মুখে হতাশ ভাব দেখে সুদীপ বলল, "কিন্তু হঠাৎ তুমি যেতে চাইছ কেন?"

লোকটা যেন ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা পেয়েছে। মুখ নিচু করে বলল, "ভাবলুম বাবুর সঙ্গে যাব, দুটো খাওয়া কি আর জুটবে না!"

লোকটাকে হোভারক্র্যাফ্টের কাছে ডেকে আনল সুদীপ। একটা টিন-ফুড বার করে এনে বলল, "একজনের দু'দিনের মতো খাওয়া চলে যায়। অল্প খেলেই পেট ভরে। একসঙ্গে বেশি খেও না যেন।"

একটা টিন-কাটারও দিল ওকে সুদীপ।

এবার অটোপাইলট নির্ভর করে এগোতে হবে। গন্তব্যের ল্যাটিচুড লঙ্গিচুড আগে থেকেই ফিড করা আছে নির্দেশকযন্ত্রের ইলেকট্রনিক স্মৃতিতে। সুদীপের কাজ হবে অটোপাইলটের ডায়ালের কাঁটাটার উপর নজর রাখা আর গাড়িটাকে এমন দিক বরাবর চালানো, যাতে লাল ভি-দাগটা ছেড়ে কাঁটাটা এপাশ-ওপাশ সরে না যায়। দিক ভুল হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই, তবে মুশকিল হচ্ছে, আস্তে-আস্তে এগোতে হবে। সময় লাগবে আরও বেশি। সাধারণত এভাবে গাড়ি চালাবার সময়ে চালককে সাহায্য করার জন্য একজন নেভিগেটরও থাকে।

হোভারক্র্যাফ্টের ইঞ্জিন চালু হলে মুখ ফিরিয়ে দেখল, লোকটা খাবারের টিনটা দু' হাতে বুকের সঙ্গে চেপে একই জায়গায় মর্মর মূর্তির মতো তখনও দাঁড়িয়ে। কেবিন থেকে কথা বললে শুনতে পাবে না, ইশারায় জানতে চাইল, "যাচ্ছ না কেন?"

লোকটার উত্তর কানে পৌঁছয়নি কিন্তু যে দিকে আঙুল দেখাল, বোঝা যাচ্ছে ওর সঙ্গীর কথা বলছে। ওই দিকেই পালিয়েছে লোকটা। ওকে বাদ দিয়ে একা বোধহয় খেতে চায় না।

অটোপাইলটের ডায়ালে চোখ রাখল সুদীপ।

সূর্যাস্তের প্রায় দেড় ঘন্টা পরে পৌঁছল সুদীপ। এতক্ষণের এত উৎকণ্ঠার পর এখন পুরো ব্যাপারটা একটা ঠাট্টার মতো লাগছে। সারাটা রাস্তা মানে অটোপাইলটে ড্রাইভ শুরু করা অবধি কী টেনশন গেছে। আর অদ্ভুত ব্যাপার, ঠিক সেই সময় থেকেই যেন যেখানে-সেখানে কাঁটাঝোপগুলোও গজাতে শুরু করেছিল। বেজায় বিরক্তিকর।

"থ্যাংক ইউ মিস্টার ফুল মুন! থ্যাংক ইউ বাপি!" জোরে-জোরেই বলল সুদীপ।

জোর করে তিন দিন যাত্রা পিছিয়ে দিয়েছিল সুদীপের বাবা। তখন অবাক হয়েছিল সুদীপ। এরকম সন্দেহও উঁকিঝুঁকি মেরেছিল যে, বাবাও কি শেষে ট্যারট কম্পিউটারের ভাগ্যগণনা আর তিথিতন্ত্রের প্রভাব এড়াতে পারল না।

অন্ধকারে অজানা দেশে পৌঁছতে হবে ভেবে মিথ্যেই ভয় পেয়েছে। জোছনার আলো অবশ্য সমুদ্রের উপকূলে এই মৃত্যুপুরীর রক্তশূন্যতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। অন্ধকারের আশ্রয়ে গা-ঢাকা দেওয়ার সুযোগ পায়নি একটি কোনও ভাঙা দেওয়াল, পাতাঝরা গাছের কঙ্কাল, লণ্ড ভণ্ড পরিত্যক্ত সৈকত-নগরী। শুধু দুরন্ত কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর সামুদ্রিক তুফানের কল্পনা জুড়েও শহরের এই বর্তমান অবস্থার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। এতটা পথ প্রায় সমতল ভূমি পেরিয়ে আসার পর মনে হচ্ছে এখানে বুঝি পৃথিবীর অতল থেকে কোনও রাগী বিস্ফোরণ এলোমেলো ছুঁড়ে দিয়েছে রাশি-রাশি বালি আর পাথর। পুরো জায়গাটা ছেয়ে অজস্র উঁচু-নিচু এবড়োখেবড়ো ঢিবি আর পাহাড়।

বারতিনেক ধ্বংসস্তূপের কেন্দ্র ঘিরে টহল দিয়েছে সুদীপ। রিপোর্ট অনুসারে দুটো একতলা বাড়ি অক্ষত থাকার কথা। তারই একটাতে রাত কাটাবে। কিন্তু একটাকেও খুঁজে পেল না সুদীপ। তবে তিনতলা একটা বাড়ি রয়েছে। রিপোর্টটা সে সম্বন্ধে যতই ভয় দেখাক, সারা রাত হোভারক্র্যাফটে বসে কাটাতে সে রাজি নয়। এতদিন টিকে আছে আর সুদীপ পা দেওয়ামাত্র হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

বাড়ির সামনে সবচেয়ে উঁচু বালির ঢিবির ওপর হোভারক্র্যাফ্‌ট নামাল। স্লিপিং ব্যাগ ও হ্যাভারস্যাক হাতে তুলে নিল।

চাঁদের আলোয় হাড়জিরজিরে বাড়িটা তার এক তলার সব কটা দরজার পাল্লা অবধি বিসর্জন দিয়ে উদার অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সুদীপের চোখে পড়ল, তিন তলার কয়েকটা জানলা চিকমিক করে জানাতে ভুলছে না, এখানে কয়েকটা কাচ এখনও আস্ত।

এক তলার মেঝের ওপর বালি জমে দরজার আধখানা প্রায় ঢেকে ফেলেছে। টর্চের আলোয় সিঁড়িটা যা হোক ধরা দিতে দেরি করেনি। কয়েক পা উঠে থমকে দাঁড়াল। সামনের কয়েকটা ধাপের অবস্থা কাহিল। রেলিংটা জায়গায়-জায়গায় ছেঁড়া তারের মতো বেঁকে রয়েছে। ওঠার সময়ে বাধা না পড়লেই হল। দরকার হলে দড়ি টাঙিয়ে নামতে অসুবিধা হবে না।

ঘরটা তার দিব্যি পছন্দ হয়েছে। খাট থেকে নাড়িভুঁড়ি বার-করা গদিটাকে নামিয়ে দিলে ওখানেই শোওয়া যায়। টর্চের আলোটা ঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে ঘুরতে-ঘুরতেই হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে দিল। ভাঙা ড্রেসিং-টেবিলের আয়না।

সুদীপ আয়নার সামনে এসে দেখল ডান দিকের কিনারায় ছোট-বড় কয়েকটা ফোঁটার মতো কী যেন লেগে আছে। হাত দিয়ে ঘষতেই একটা খসে এল। দু' আঙুলের চাপে ময়লা সরে যেতেই সেটা একটা লাল টিপ হয়ে গেল। সুদীপের বোন নিনা এইরকম নানা রঙের টিপ পরতে ভালবাসে।

এই প্রথম ভয় পেল সে। এই ঘরে এক দিন লোক বাস করত মনে হতেই তার গা শিরশির করে উঠল।

আর নয়। এ লং ডে অ্যাহেড। সংক্ষিপ্ত ভোজনপর্ব সেরে স্লিপিং ব্যাগে সেঁধিয়ে গেল।

স্লিপিং ব্যাগ থেকে মাথা বার করে তাকিয়েই চোখ বুজে ফেলল সুদীপ। ঘুম ভাঙা আর চোখ ধাঁধানোটা ঘটে গেছে একই সঙ্গে। খাটের উপর থেকেই দেখতে পাচ্ছে, দূরে বিন্দু-বিন্দু অসংখ্য সূর্যে পরিণত সমুদ্রটা থিরথির করছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠল। দক্ষিণের বারান্দার দরজাটা ভেঙে বেমক্কা ঝুলে পড়েছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে পারলে হত, কিন্তু সেখানে বেরোবারই উপায় নেই। জানলার সব ক'টা কাচ আস্ত নেই, কিন্তু গলে বেরোতে গিয়ে হাত-পা কাটতে পারে।

সিঁড়িটা বিট্রে করেনি। নির্বিঘ্নে নীচে নেমে এল সুদীপ। এক তলায় বালি-ঢাকা মেঝেয় পা দিয়েই মনে হল ভিজে-ভিজে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছিল বাইরে। হোভারক্র্যাফ্‌টের চিহ্ন নেই।

একসঙ্গে অনেকগুলো সম্ভাবনার কথা মাথায় আসে। সামনের ওই উঁচু ঢিবিটার উপরেই যে কাল রাত্তিরে ওটা পার্ক করেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কী হতে পারে?

সুদীপ ঢিবিটার উপর এসে হাঁফ ছাড়ল। কিন্তু হোভারক্র্যাফ্‌ট ওখানে গড়িয়ে পড়ল কী করে?

দৌড়ে নেমে গেল। স্রেফ লাকই বলতে হবে! গাড়িটা যদি একেবারে উলটে যেত, একা সুদীপের সাধ্য হত না টেনে সোজা

১	২	■	৩		৪	৫	■	৬	৭
৮				■	৯			■	
■	■	■	১০	১১			■	১২	
১৩		১৪	■	১৫		■	১৬		
	■	১৭	১৮	■	১৯	২০			■
■	২১			২২	■	২৩		■	২৪
২৫			■	২৬	২৭	■	২৮		
২৯		■	৩০			৩১	■	■	■
	■	৩২			■	৩৩		৩৪	৩৫
৩৬		■	৩৭				■	৩৮	

সংকেত : পাশাপাশি : (১) বিশ্ববিখ্যাত মসজিদ। (৩) যাপন আর বিনোদনের অপেক্ষায়। (৬) মুকুট। (৮) এর প্যাঁচে প্রতিপক্ষ ধরাশায়ী হয়। (৯) আপত্তি। (১০) ওলটালে খারাপ আচরণ। (১২) উচিত। (১৩) দেশান্তর। (১৫) কথায় বলে দুর্বাসার—। (১৬) প্রাচীর। (১৭) দাঁতে কেটো না। (১৯) সপ্তপাতালের একটি। (২১) মুগ্ধ চোখ যা হতে চায়। (২৩) বুড়ো হলে প্রত্যেকের শরীরেই আসে। (২৫) পত্নী। (২৬) আশ্রয় ছাড়া খাড়া হতে পারে না। (২৮) চাঁদ যখন বঙ্গসম্রাট। (২৯) কোকিল। (৩০) অব্যাকুল। (৩২) পাখির ডানায় থাকে। (৩৩) মুনি, আবার পাখিও। (৩৬) পায়রার এক প্রজাতি। (৩৭) বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একজন। (৩৮) 'এ তো বড়ো—জাদু...'।

উপর-নীচ : (১) বাদামবিশেষ। (২) খাটও যে-গয়না পরে। (৩) দেবতাদের শত্রু। (৪) বণিক। (৫) সমাজের এক বন্ধু। (৭) মেঘ। (১১) শিশু গাছ। (১২) যে-হ্রদে সূর্য অস্ত যায়। (১৩) নাগাল না-পেলেই টক। (১৪) জ্ঞানীগুণীদের সম্মান জানিয়ে লেখা হয়। (১৬) সকালে খাই। (১৮) নুড়ি যার দোসর। (২০) পুজোয় কী চাই নতুন? (২১) চুল। (২২) পাখির কিচিরমিচির। (২৪) পদ্মের জন্মস্থান। (২৫) মুনির নামে আর-এক পাখি। (২৭) আঁচ, উষ্ণতা। (৩০) কুবেরের পুরী। (৩১) 'জলসিঞ্চিতক্ষিতিসৌরভ—ে—'। (৩৪) দরজা। (৩৫) যুদ্ধ।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

আ	মা	জ	ন	■	হা	■	ধ	ম	নি
ত	■	র	ঙ্গ	তা	মা	শা	■	নি	শা
শ	নি	■	র	ড়	■	ব	জ	ব	জ
বা	ম	■	■	ক	ন	ক	ন	■	ল
জি	■	ক্ষু	র	■	ড়ি	■	স্থা	ণু	■
■	য	দি	■	ভা	■	স	ন	■	ল
তা	■	রা	মা	নু	জ	■	■	ঘ	ট
ম	তা	ম	ত	■	ল	ব	■	ন	ব
র	মা	■	ন	গা	ধি	রা	জ	■	হ
স	ম	তা	■	ঙ	■	হ	রি	দ্বা	র

রঞ্জন

করা। বালির স্তূপের গায়ে কাত হয়ে রয়েছে। সুদীপ দু' হাতে একটা কিনারা ধরে ঝুলে পড়তেই খাড়া হয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে চালিয়ে বার করে নিয়ে যেতে অসুবিধা হবে না।

সিটে বসতেই পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারল। রাত্তিরে জোয়ারের জল বেড়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কতটা জল উঠেছিল ? কমপক্ষে ওই বাড়িটার দেড় তলা সমান নিশ্চয় ? আর ভাবতে চায় না সুদীপ। এখন বড় প্রশ্ন, গাড়িটা চালু হবে কি না।

ইগ্‌নিশন অন করে ফুয়েল গেজের দিকে তাকিয়ে দেখল ট্যাঙ্ক খালি। পুরো ডিজেলটা পড়ে গেল ! ব্লাডার ! গ্রেট ব্লাডার ! বেজায় ভুল করেছে। এতক্ষণে মনে পড়েছে কাল যাত্রা শুরু করার সময়ে সেই যে ডিজেল ইঞ্জিন চালিয়েছিল, সোলার ড্রাইভে আর সুইচ-ওভার করেনি। সারাটা পথ তেল পুড়িয়েছে। অথচ উচিত ছিল, ব্যাটারি চার্জ হয়ে গেলেই... পুরনো ব্যাটারিটা যদি এখন বিট্রে করে ! রীতিমত ভয়ে-ভয়েই সুইচ দেয়।

যাক। ব্যাটারি ডোবায়নি। আর ঝুঁকি নিতে রাজি নয় সুদীপ। ব্যাটারির আয়ু চেক করে নিতে হবে। ড্যাশবোর্ডের নব ঘুরিয়ে দেখল একশো চুয়াত্তর অ্যাম্পিয়ার আওয়ার। তার মানে দিনের আলোয় সোলার সেলগুলো যদি কাজ নাও করে, তবু ঘন্টা-চারেক চালানো যাবে।

তার মানে আধ ঘন্টার মধ্যেই ঘোরাঘুরি শেষ করে ফেরার পথ ধরতে হবে। হোভারক্র্যাফ্‌ট এগিয়ে চলল উপকূলের দিকে। ভাঁটার টান সমুদ্রকে সরিয়ে দিয়ে সুদীপের পরিক্রমার সুবিধার জন্য মসৃণ ভিজে বালির একটা পাড় বানিয়ে রেখেছে।

আধ ঘন্টা কেন, মাত্র দশ মিনিট বাদেও সুদীপ যদি ফেরার পথ ধরতে বাধ্য হত, তেমন কিছু মিস করত না। যত দূর চোখ যায় একই দৃশ্যের বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি। বালিয়াড়ি আর সমুদ্রের মধ্যে ভিজে চিকচিকে মসৃণ তটে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে নানা আকারের ও আকৃতির অজস্র মরা মাছের কঙ্কাল। জ্যান্ত মাছ কি ঝিনুক অবধি যেন অঞ্চলটাকে এড়িয়ে চলে। কঙ্কাল দেখে মাছ চেনার বিদ্যে সুদীপের নেই। শুধু কয়েকটা হ্যামার-হেড হাঙর চিনতে পেরেছে। ছবি তুলেছে।

মিনিট পনেরো বাদে একটা জায়গা দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পরপর কয়েকটা কাঠের খুঁটি পোঁতা আছে। কাছে গিয়ে মনে হল, বোধহয় বিরাট দাঁড়িপাল্লা গোছের কিছু ছিল। আন্দাজটা ভুল নয়, কারণ তারই আশেপাশে স্তূপাকার হয়ে রয়েছে মাছের কঙ্কাল আর বিভিন্ন ভঙ্গিতে মুখ থুবড়ে পিঠ উলটে পড়ে আছে জেলে-ডিঙি। সম্ভবত এখানে ফিশিং হ্যামলেট ছিল। কেনা-বেচার আসর বসত।

আবার দু-তিনটে ছবি।

ফেরার পথে সুদীপের মন আরও খারাপ করে দিল ছোট্ট একটা হালকা বেগনি-রঙা ফুল। প্রায় কুড়ি মিনিট ঘোরার পর একমাত্র প্রাণের নিদর্শন তাকে খুশি করেনি। জংলি লতাটা দুঃসাহসিক ভাবে দূষিত পরিবেশের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছে, কিন্তু তার অবশিষ্ট চারটি পাতার তিনটিই এখন প্রায় হার স্বীকার করতে বসেছে। বিবর্ণ চেহারা। ধুতরোর আকৃতির ছোট্ট ফুলটাও বোধহয় তাই সে-কথা টের পেয়েই মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

ক্যান্টিন বার করে জল ঢালতে গিয়েও ঢালল না। বালিতেই যার চোদ্দপুরুষের আস্তানা, অভাবটা তার জলের নয় নিশ্চয়।

পথের নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও বাড়ি ফিরতে মাত্র ঘন্টাচারেক দেরি হয়েছে। কিন্তু তারই মধ্যে মা অধৈর্য হয়ে বাবাকে বারবার তাগাদা শুরু করেছিলেন, কেন এখনও ওয়ারলেসে খবর পাঠাচ্ছে না।

মোড়ের ওপার থেকেই সুদীপ হর্নটা একটানা চেপে রেখেছিল। বাড়ি ফেরাটা বেশ সগর্জনে ঘোষণা করতে চায়।

বাবা মা'কে রাস্তায় অপেক্ষা করতে দেখে অবাক হয়নি। কিন্তু হিংসুটে নিনাটা কেন ? একটা হ্যাঁচকা ব্রেক আর স্টিয়ারিং-এর পাকা মোচড়, বেশ গ্যাংস্টারের মতো দাঁড় করাল গাড়িটা। বাবা নিশ্চয় অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন। চাকা আর কার্বের মধ্যে পাঁচ মি· মি-র বেশি ফাঁক নেই।

ধাঁই করে দরজা বন্ধ করে নেমেই সুদীপের চোখে পড়ল, বাবার পুরনো কোটটার সামনের একটা বোতাম নেই।

সুদীপ বলল, "হোভারক্র্যাফ্‌টটা ফেরত দিয়ে এলাম। বাবা, ওটা কিন্তু স্লাইটলি ড্যামেজ হয়েছে। বলল সাতাত্তর ডলার অ্যাডিশনাল বিল হবে। বিশ্বাস করো, আমি..."

বাবা ঠোঁট টিপে হেসে সুদীপের হ্যান্ডশেক করলেন। সুদীপ নিশ্চিন্ত হয়। মা এখনও রাগী মুখ করে ভুরু কুঁচকে করেছেন। নিনার গাল টিপে মনে হল ভুল করল। একটি চাঁটি প্রাপ্য। মহা শয়তান। তোর অমন গম্ভীর ভান করার কী হয়েছে ?

আধ ঘন্টা বাদে চায়ের টেবিলে বসে মা বললেন, "তোমরা যাই বলো, এ স্রেফ গরিবের ঘোড়া রোগ। কোনও দরকার ছিল না, অ্যাস্ট্রো স্কুলে ভর্তি করার। ওখানে না পড়লে কি আর..."

নিনা হেসে বাধা দিল। "মায়ের দেখছি দুশ্চিন্তা কমার সঙ্গে রাগ বাড়ার ইনভার্স রিলেশন।"

"চুপ কর। এই আমি বলে দিচ্ছি, ঝুঁকি নিচ্ছ ভাল কথা, কিন্তু তবু দেখবে শেষ রক্ষা হবে না।"

বাবা বললেন, "শেষ রক্ষা আবার কি ? প্রি-টেস্ট তো ধরো হয়েই গেল। ঝামেলার মধ্যে বাকি শুধু ফাইনাল ক্যুইজ। তারপরে তো স্কলারশিপের ওপর দিয়েই যাবে।"

মা তবু ছাড়তে রাজি নয়। "কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না। সেই যখন ওকে চাঁদেই পাঠালে না..."

"পাঠালাম না বোলো না। বলো পাঠাবার উপায় ছিল না। দু' হাজার ডলার কোত্থেকে..."

"তা বলছি না। চাঁদে না গিয়েও যদি পরীক্ষায় বসার সুযোগ পায়, তবে এইভাবে বিপজ্জনক জায়গায় না গেলে বা কী ক্ষতি ছিল ?"

"ক্ষতি মানে ! যেতে তো হতই। ওদের প্রসপেক্টাসে লেখা আছে, ভেকেশনে একটা সত্যিকারের দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারে যেতে হবে। তার ওপর রিপোর্ট জমা না দিলে পরীক্ষায় বসতে পারবে না। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে সবাই ধরেই নিয়েছে অ্যাডভেঞ্চার ট্রিপ বলতেই মহাশূন্যে পাড়ি বোঝায়। আর কিছু না হোক, চাঁদে তো যাবেই। বিশেষ করে অ্যাস্ট্রো-স্কুলের ছাত্র যখন।"

"এও তো একরকম ঠকানো।"

"কক্ষনো নয়। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, সুদীপের বন্ধুদের দল বেঁধে স্পেস ট্র্যাভেল করে যা অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর তার চেয়ে কিছু কম হয়নি।"

সুদীপ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "জানো বাবা, আমি প্রমাণ নিয়ে এসেছি যে, ওই অঞ্চলে বেআইনি ভাবে কিছু দিনের মধ্যে নিউক্লিয়ার রকেট টেস্ট করা হয়েছে।"

"আচ্ছা ! কিন্তু সেটা তোমার রিপোর্টের মধ্যে উল্লেখ না করাই ভাল। ওর অন্য ইমপ্লিকেশন আছে। রাজনৈতিক হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে লাভ নেই। আমি বরং একটা মজার জিনিস দেখাই।"

মায়ের দিকে চেয়ে বাবা বললেন, "অ্যালবামটা রাখলে কোথায় ?"

এতক্ষণে মায়ের মুখে হাসি। মা অ্যালবামের পাতা উলটে একটা ছবি বাড়িয়ে দিলেন।

সুদীপ ও নিনা ঝুঁকে পড়ল।

"এ তো তোমাদের ছবি।"

"হ্যাঁ, কোথায় তোলা জানিস ? দিঘায়। তুই যেখান থেকে ঘুরে এলি।"

"সে কী!"

নিনার হাত থেকে অ্যালবাম টেনে নিল সুদীপ।

মা বললেন, "আমাদের বিয়ের বছরখানেকের মধ্যে। নিজেদের তো ক্যামেরা ছিল না। তোলানো হয়েছিল। এটা হোটেলের সামনে। সমুদ্রের ধারের ছবিটা খুঁজে পেলাম না। কত যে লোক তখন বেড়াতে আসত। জমাট ট্যুরিস্ট-স্পট। ক' বছরের মধ্যে কী যে ঘটে গেল! এখন বেড়ানো বললেই স্পেস ছোটো!

সুদীপ চেঁচিয়ে উঠল, "আমি তো এই বাড়িটাতেই কাল রাত্তিরে ছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই দ্যাখো, ছবিতে স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে 'ট্যুরিস্ট লজ'। যে-ঘরটায় কাল শুয়েছিলাম, তার মধ্যে একটা ড্রেসিং টেবিলের কোণে ইংরিজি হরফে লেখা ছিল টি· এল। এই সেই তিন তলা বাড়ি।"

সুদীপের মুখ থেকে দু'দিনের পুরো বিবরণ শোনার পর বাবা বললেন, "তোমার যা অভিজ্ঞতা তাতে দেখছি তিন হাজার কেন পাঁচ হাজার শব্দের রিপোর্ট লিখতে বললেও অসুবিধে হত না।"

সুদীপ বলল, "রিপোর্টের শেষ প্যারাগ্রাফটা কী হবে তাও ভেবে ফেলেছি। ব্যাপারটা খুব মজার। ফেরার পথে খড়গপুরের কাছাকাছি তখন, হঠাৎ দেখি সামনে একটা গাড়ি। ইনফ্যাক্ট, এই প্রথম গাড়ি দেখলাম। কীরকম পাগলের মতো লাগল। ওভারটেক করেই ব্রেক মেরে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পিছনের গাড়ির ড্রাইভার অবাক হয়ে দরজা খুলে নেমেছে, কিন্তু কিছু বলার সুযোগ পেল না। তার আগেই জোরসে বারতিনেক হ্যান্ডশেক করে আর 'গুড আফটারনুন' বলে আমি গাড়িতে ফিরে এলাম। আর কোনও কথা নেই। নিশ্চয় ভাবল, আস্ত পাগল। ও তো আর জানে না, চোদ্দ ঘন্টা বাদে একটা মানুষের মুখ দেখার পর কী রকম হয়।

বাবা বললেন, "বুঝতে পারছ, অ্যাস্ট্রোনটদের যখন মাসের পর মাস একা অরবিটাল স্টেশনে বা..."

"ঠিক সেই কথাটাই তো লিখব ভেবেছি। এ স্মল টাচ অব থিংস টু কাম্।"

"যাক্ এ সব থাক এখন। প্রি-টেস্টে অ্যালাও হওয়া নিয়ে তো আর সমস্যা নেই! কিন্তু সামনে আরও বড় চ্যালেঞ্জ। তুমি জানো, তোমার সব বন্ধুই ফাইনাল টেস্টের মুন-ক্যুইজে বসার আগে চাঁদে পাড়ি দেবে। হয়তো অনেকে কয়েকবার ঘুরেও এসেছে এরই মধ্যে। তুমি কিন্তু সে-সুযোগ পাবে না।"

"ওহ্! সে তো আমি জানি। গত পাঁচ বছরের লুনার এক্সপিডিশনের সমস্ত রিপোর্ট আর ম্যাপ তো তুমি জোগাড় করেই দিয়েছ। চাঁদের তিনটে আর্টিফিশিয়াল কলোনির যে-কোনওটাতে আমি এই কলকাতার চেয়েও সহজে চলাফেরা করতে পারি। ছবির মতো দেখতে পাই চোখের সামনে।"

সুদীপ কনফিডেন্ট। টেস্টে তাকে কেউ আটাতে পারবে না। তবে এটাও ঠিক যে, একবারও স্পেসে ট্র্যাভেল না করে সত্যিই যদি সে সফল হয় সেটা অ্যাস্ট্রো-স্কুলের ইতিহাসে প্রথম।

মুন-ক্যুইজ টেস্টে শুধু উতরে গেল না সুদীপ, সারা বছরের পারফরমেন্সের বিচারে প্রথম স্থান পেয়েছে। স্কুলের অ্যাস্ট্রোনট-টিচাররা কিন্তু আজও জানেন না, সে পৃথিবীর বাইরে কখনও পা দেয়নি।

স্কুলের অরগানাইজড ট্রিপেই সবাই রকেট পাড়ি দেয়, তা নয়। প্রাইভেট সার্ভিসের সাহায্য নিতেও বাধা নেই। সেইজন্যেই ধরার উপায় ছিল না।

রেওয়াজমতো যথাসময়ে সুদীপের কাছেও টিভি সেন্টার থেকে আমন্ত্রণ এল। অ্যাস্ট্রো-স্কুলের এ-বছরের সেরা ছাত্রের ইন্টারভিউ প্রচারিত হবে। পনেরো মিনিটের লাইভ প্রোগ্রাম।

স্কুল-জীবন সম্বন্ধে দু-চার কথার পরেই প্রশ্নকর্তা চাঁদ নিয়ে পড়লেন। এও যেন আর-এক ক্যুইজ, তবে এখানে প্রশ্নকর্তাই বেশি ব্যস্ত নিজের জ্ঞান জাহির করতে। সেই নিষিদ্ধ প্রশ্নটা কিন্তু এবার উঠল শেষ পর্যন্ত, "চাঁদে তো গেছই, স্পেসে আর কোথায় গেছ।?"

সুদীপ বলল, "কোথাও যাইনি।"

"কোথাও যাওনি। দ্যাটস গ্রেট!"

কিন্তু এখানেই থামলেন না প্রশ্নকর্তা "চাঁদে ক'বার গেছ?"

"একবারও না।"

"বলছি চাঁদে ক'বার গেছ?"

"বলছি তো..."

টিভি সেটটা হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে গেল। সুদীপের বাকি কথাগুলো শোনা গেল না। তারপরেই স্ক্রিনে হিজিবিজি রেখার দৌড়োদৌড়ি।"

মা ছুটে গেলেন, "ঠিক সময়েই সেটটা বিগড়োল। আশ্চর্য!"

বাবা বললেন, "উঁহু টিউনিঙের ব্যাপার নয়। চলে এসো। সেট ঠিকই আছে। গণ্ডগোলটা টিভি স্টেশনেই।"

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ। তুমি বুঝতে পারছ না? সিম্পল সেন্সার থেকে আটকে দিয়েছে। ওরা চায় না স্পেস ট্রাভেল না করেও একজন অ্যাস্ট্রোনটের ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে এরকম উদাহরণ প্রচারিত হোক।"

এবার টিভি স্ক্রিনে পরিচিত ঘোষকের ফরসা মসৃণ মুখটা ভেসে উঠেছে: টেলিকাস্টের যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন এই আকর্ষণীয় ইন্টারভিউয়ের বাকি অংশ প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে না। সরি ফর্ দা ইন্টারপশন!

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

দি বোম্বেটে ব্যায়াম সমিতি

সমীর মুখোপাধ্যায়

ঘুমোতে যাবার আগে বাকোর গল্প চাই। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়েস হলেও বাকো বাকোই আছে। বাবার গলা জড়িয়ে গা-ছমছমে গল্প শুনতে ও বড্ড ভালবাসে। আজ বাকোর অন্য বাহানা। বাবার পাশটিতে গুটিসুটি শুয়ে ও বললে, "হ্যাঁ বাবা, লোকেরাই তো সাধু হয়?"

বাকোর বাবা বললেন, "ঠিকই তো। কেন, তোমার সন্দেহ হচ্ছে নাকি! তা হঠাৎ সাধু প্রসঙ্গ?"

"আজ একটা লোক এসেছিল গেটের সামনে। বললে, ওরে বাকো, ওরে শিগগির।"

"তা তোমাকে চিনল কী করে? কীরকম সাধু?"

"জানি না। বোধহয় শুনেছে, মাঠের ছেলেদের কাছে। আমি বললাম, আপনার নাম? সাধু বলল, মহারাজ। বললাম, কী চাইছেন? উনি বললেন, ভিক্ষে রে, ভিক্ষে। মা ভিক্ষে দিলে। সাধু চলে গেলেন। খুব সুন্দর, তাই না বাবা! কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়, কেউ ডাক্তারবাবু হয়, কেউ মাস্টারমশাই হয়, কিন্তু সাধু—বেশ একটু অন্যরকম, তাই না বাবা!"

"তা তো বটেই। তা শুনবে নাকি আজ এক সাধুর গল্প? ঠিক সাধু নয়, সাধু হয়ে যাওয়ার গল্প। আমার ছোটমামা সাধু হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিনের জন্যে। শুনবে?"

"বলো। আচ্ছা বাবা, কথা বলতে গেলে তোমার বাঁ দিকের চোখ কেন কুঁচকে যায়? হিহি।"

"ওই দ্যাখো, দুষ্টুমি শুরু করলে।"

"ঠিক আছে। এই চুপ করলাম। দাঁড়াও, ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা মুখে পুরি আগে। এরপর আর কথাটি নয়। জয়হিন্দ।"

"ওটা কী হল? হঠাৎ জয়হিন্দ? যাক, শোনো।" বাকোর বাবা গল্প শুরু করলেন।

"আমার ছোটমামা খুব ডানপিটে ছিল এ-কথা বললে তেমন কিছু বলা হয় না। গায়ে ছিল অসুরের শক্তি। মামা..."

"তোমার মামা তা হলে ক্যারাটে জানত? প্রথমে ডান পা আগে, তারপর বাঁ পা, তারপর আবার ডান পা, তারপর বাঁ পা, হুইশ-হুইশ মুখে আওয়াজ করত?"

"না, তখন কোথায় কী? তখন সন্ধে হতে-না-হতেই আশেপাশের বনে ফেউ ডাকত। এখন যেমন দেখছ সপ্তাহে কোনও-কোনওদিন ঘণ্টাখানেকের জন্যে লোডশেডিং,তখন লোডশেডিং ছিল না, ছিল ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। ইলেকট্রিক ছিল না হুগলিতে, গ্যাসবাতি ছিল না, কেবল বালির মোড়ে পুলিশফাঁড়িতে একটা তেকোনা কাঁচের মধ্যে একটা বড় লম্ফ সারারাত ধরে জ্বলত।"

"তোমার মামা টিসুম-টিসুম জানত?"

"না। তখন কোথায় টিসুম-টিসুম? তখন সিনেমাই তৈরি হয়নি চুঁচড়োয়। কে করবে টিসুম-টিসুম? তখন চারদিক ছিল আঁধার-বনে ঢাকা। এখন যেমন দেখছ বালির মোড় থেকে ব্যান্ডেল স্টেশন পর্যন্ত

খালি বাড়ির পর বাড়ি, লোক গিজগিজ করছে, তখন খালি বন, সব বনে ঢাকা, জঙ্গলের পর জঙ্গল,রাস্তার দু'পাশে ছিল বাঁশঝাড়, বাঁশেরা নেমে আসত রাস্তায় মানুষের দুটো হাতের মতো, দিনমানে অতি সামান্য লোক-চলাচল করলেও সন্ধেবেলায় ওদিক কেউ মাড়াত না। কেবল মিয়াজান কোচোয়ানের ঘোড়ার গাড়ি চলত। সে কোনও আফিংখোর, ভূত-পেরেত, দস্যি-দানব, চোর-ডাকাত কিচ্ছু মানত না। বলত, ফুরুত। বলে নাক দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বার করত। বলত, বুয়েচ, আমি যেই ফুরুতটি গাইব অমনি সব ফক্কা। চোর-ডাকাত রাহাজান-কালাজান, জিন সব জব্দ। ফুরুতটি শিখেছিলাম এক গনৎকারের কাছ থেকে।"

"তোমার মামার কী হল, এ তো অন্য দিকে সাইড নিচ্ছ।"

"সেই কথাতেই তো আসছি। পুরনো হুগলির কথা না বললে, ওই রাস্তাটার কথা না বললে, তুই তো আজকের ছেলে, সেকালের গল্পটা বুঝবি না। বালির মোড় থেকে ব্যাণ্ডেল স্টেশন, এই রাস্তাটা মনে রাখিস, যেমন-যেমন বললাম। এখন রাস্তা থাক। যখন সময় হবে তখন রাস্তায় ফের আসা যাবে। ছোটমামা ছিল রিং-লিডার। আমাদের মতো বয়েস যাদের তাদের কাছে তো বটেই, ছোটমামার বয়সী যারা, ছোটমামার থেকেও যারা বড়—তাদের সবার কাছে ছোটমামা ছিল মুকুটহীন রাজা। একশো'র ওপর ছেলে মামাকে মেনে চলত।"

"আর না মানলে?" বাকো মুখে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে জুলজুলে চোখে ওর বাবার দিকে তাকাল।

"মার। সে এক অমানুষিক ব্যাপার। ও সব গার্জেন-ফার্জেন মানত না।"

"সে কী গো," বাকো চোখ গোল-গোল করে বলল, "তোমার মামা মস্তান ছিল নাকি?"

"দুর, তা হবে কেন? তখন ওসব মস্তান-টস্তান ছিল না। চাকু-মাস্টার, বোম-মাস্টার ছিল না। গুণ্ডা-ফুণ্ডা নয়, এমনই, গায়ে ছিল অসুরের শক্তি। সে সময় হুগলিতে অরূপ মিত্র বলে এক পালোয়ান ছিল। সে যেমন পালোয়ান তেমনই ধনী। অনেকে ওর কাছে সোনাদানা বন্ধক রাখত,সময়মতো টাকা শোধ দিতে পারত না। অরূপ মিত্র ওদের সোনাদানা, জোতজমি সব হজম করে ফেলত। এদিকে মামলা-মকদ্দমাতেও মাথাটি খুব সাফ। প্রায় গোটা হুগলির মাটি চলে গিয়েছিল অরূপ মিত্রের পেটে। তা ওর ছেলেকে ও একদিন লড়িয়ে দিলে ছোটমামার সঙ্গে। আসল কথা, গরিবের ছেলে ছোটমামার এত ঠাটবাট, এত মাতব্বরি, সর্দারি অরূপ মিত্রের সহ্য হচ্ছিল না। কিছুতেই ছেলেটাকে জব্দ করা যাচ্ছে না। দেখি, যদি নিজের ছেলেটাকে দিয়ে ওর মাথা হেঁট করতে পারি। মূল কারণ হচ্ছে,আমার এত আম-কাঁঠালের বাগান, একটা ফসলও এই ছোকরা আর তার দলবলের জন্যে পাওয়ার জো নেই। নির্দিষ্ট দিনে কুস্তির আসর বসল। আমরা সবাই জমায়েত হয়েছি। মামা আখড়ার মাটি মাথায়, কপালে ঠেকিয়ে আবা, আবা করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।"

"আর অমনই তোমরা সব সিটি বাজালে!" বাকো বলল।

"না বাকো। সিটি-ফিটি ছিল না সে-সময়। যতসব উদ্ভট কাণ্ড এখনই দেখি। যাই হোক, অরূপ মিত্রের মোটাসোটা ছেলেটা একটা ঝলকদার আঁটো প্যান্ট পরে নামল। কত কায়দাই জানে। মাটিতে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছোটমামার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেকের জন্যে। আমাদের বুক ঢিবঢিব করছে। এ-যেন হাতির পাশে ইঁদুর। অরূপ মিত্রের ছেলের পাশে ছোটমামাকে দেখাচ্ছে ওইরকমই। মনে-মনে বজরংবলির নাম নিচ্ছি আমরা সবাই। জয়বাবা বজরংবলি, তোমার নামে পুজো দেব বাবা। এবারটি মান রাখো বাবা। তো, ছোটমামা হুঙ্কার দিয়ে কী সব বলেএগিয়ে গেল, আর এক মিনিটের মধ্যে অরূপ মিত্রের ছোট, সাদা হাতিটিকে পটকে দিল। একেবারে কুপোকাত। মাটিতে চিত হয়ে পড়ে একেবারে নট-নড়নচড়ন। আমাদের মধ্যে রশিদ ছিল সবচেয়ে ডিত্তু, ও আর থাকতে পারল না, বললে, মরে গেল নাকি? জানে মার দিয়া?"

"বাবা গো জমে গেছে। তারপর, তারপর?"

"তারপর তো সে এক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। অরূপ মিত্রের মুখ টকটকে লাল হয়ে গেল। ও আখড়ার মাটিতে নেমে পড়ে ওর চিত হয়ে পড়ে-থাকা ছেলের গায়ে ক্যাঁত-ক্যাঁত করে লাথি মারলে, বললে, ঘি, দুধ, ক্ষীর খেয়ে শেষে একটা ফ্যান-চাটা ঘরের শুটকে খেঁকুরে-মার্কা ছেলের কাছে হেরে গেলি? এই ছেলেটা, কী যেন নাম তোর, এবার থেকে ফি-সকালে আমার গোয়ালঘরে আসবি। তোর এক সের করে কাঁচা দুধ বাঁধা। ওর ছেলেটাকে আর এক-প্রস্থ লাথি মেরে বলল, এটার আজ থেকে দুধ, ঘি, বাদাম, ক্ষীর সব বন্ধ, সব বন্ধ। আমার মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। এদিকে পড়াশুনোতেও ছোটমামা খুব দড়। ওয়ান থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত বরাবরই ফার্স্ট। যখনকার গল্প বলছি, তখন ছোটমামা ক্লাস টেনে পড়ে। সেন্ট পিটার স্কুলে পড়ে। চার্চের আন্ডারে স্কুল। ফাদার ওয়ালেশটন তখন হেডমাস্টার। বিকেলবেলায় মামা এসে বসত বালির মোড়ে ফাঁড়ির সামনে বিষ্টুদার কাপড়ের দোকানের সামনের বাঁধানো চত্বরে। আর আমরা মামাকে ঘিরে বসতাম।"

"তারপর?"

"তারপর শোনো, একদিন হয়েছে কি, আমরা মামাকে ঘিরে বসে আছি, মামা রবার্ট ব্লেকের দুঃসাহসিক ডিটেকটিভ গল্প বলছে, তখন অবশ্য অনুবাদ-টনুবাদ বুঝতাম না, তখন মনে হত মামা বোধহয় বানিয়ে-বানিয়ে বলে যাচ্ছে আর বানাতও খুব, পরে বড় হয়ে পড়ে দেখেছি। সে যাক। এমন সময় অক্ষয়বাবু, ডানলপে কাজ করেন, ইয়া ভুঁড়িদার মানুষ, টেবো-টেবো গাল, উনি সঙ্গে নিয়ে এলেন ওঁর এক ছেলে বলাইকে। বলাইকে আমরা খুব বাজে বলে জানতাম। অক্ষয়বাবু ছোটমামাকে বললেন, বাবা গোকুল, ছেলেটা একটু ইয়ে হয়েছে বাবা। অকালে পেকে গেছে বাবা। ছোটমামা একনজরে বলাই-এর দিকে তাকাল। বাপ রে বাপ, ছোটমামার দৃষ্টি কী! ছুঁচের মতো সরু করে একটু তাকাল ওর দিকে। তারপর বললে, পাকেনি ঠিক। তবে দরকচা মেরে গেছে। তা কী করতে হবে? অক্ষয়বাবু বললেন, ওকে একটু মানুষ করে দিতে হবে বাবা। তোমাদের সমিতিতে ভর্তি করে নিতে হবে। মোটকথা ওকে নিয়ে আর পেরে উঠছি না।

"পেরে উঠছেন না? মামা ওর দিকে তাকাল, তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বললে, এই দরকচা-মারা, একটু ঘুরে দাঁড়া। পিলে-চমকানো সে আওয়াজ শুনে ছেলেটা ভয়ে-ভয়ে তাড়াতাড়ি ফাঁড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

"মামা সিধে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বলা নেই কওয়া নেই,অক্ষয়বাবুর সামনেই বলাইকে মারলে বিরাশিসিক্কা ওজনের এক থাপ্পড়।

"বলাই ওরে বাপ্ রে বলে মুখ থুবড়ে পড়ল। অক্ষয়বাবু হাতজোড় করে বললেন, তুমিই পারবে বাবা। শুধু হুগলির নয়,একদিন এ-বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করবে তুমি, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। তা তোমার নজরানা বাবা? মামা হেসে বলল, ছেলে নিয়ে আপনার ভাবনা দূর করে দিলাম, এই আমার নজরানা। কেবল একটা কথা, হুইসল্ যখন মারব সে রাত যতই হোক, বর্ষাকালই হোক শীতকালই হোক, ফাইনে এসে দাঁড়াতেই হবে। মোটমাট এ-ছেলে আজ থেকে আর আপনার

নয় সমিতির। অক্ষয়বাবু বললেন, তা সমিতির নাম কী বাবা ? আমি গর্বের সঙ্গে মামার হয়ে বলে দিলাম, দি বোম্বেটে ব্যায়াম সমিতি।"

"বাবা, জমে গেছে গো বাবা। কোথায় লাগে এর কাছে চিসুম-চিসুম। লাগাও বাবা, লাগাও।"

বাকো ছটফট করে উঠল। বাকোর বাবা বললেন, "লাগাচ্ছি রে হতভাগা। চুপ মেরে শোন। সমিতির প্রায় সবাই আমরা ছিলাম সেন্ট পিটার হাই স্কুলের ছাত্র। আমাদের মধ্যে যারা ডেপো তারা বলত সেন্টি পোঁ কলেজ। সেন্টি পোঁ কেন বলত আজও জানি না। সেন্টি পোঁ কলেজের সব ছাত্র আমরা রোজ-রোজই বিকেলে চার্চসংলগ্ন মাঠে খেলতে যেতাম। বল ইস্কুলই দিত। এতদিন সব বেশ চলছিল। হঠাৎ একটা বিপত্তি দেখা দিল। মাঝে-মাঝেই বল মাঠ থেকে ছিটকে চার্চের ভেতর চলে যেত। এর আগে চার্চের যে দরোয়ান ছিল, সে খুব ভাল লোক, সে বল দিয়ে দিত। ক' মাসের জন্যে লোকটা কোথায় চলে গেল। এরকম একটা দিনে, কান্তদা একটা লাথি মারলে, বলটা চার্চের মধ্যে চলে গেল। চার্চের মধ্যে একটা ল্যাংড়া সাহেব ছিল, তার নাম ব্রাদার স্মিথ। লোকটা বোধহয় তক্কে-তক্কে ছিল। বলটা দেখামাত্র আর ফেরত দিল না। আমরা অনেক করে বললাম। কিন্তু স্মিথ কিছুতেই দিল না, উলটে বলল, দুষ্টু, বদমাশের দল, টোমরা চার্চের ক্ষতি করিয়াছ। এবার আমি টোমাদিগে বাগে পাইয়াছি। এবার আর ছাড়িব না। আমরা অগত্যা সুবিচারের আশায় ফাদার ওয়ালেশটনের শরণাপন্ন হলাম। ফাদার শান্তভাবে সব শুনে বললেন, ইহা তোমাদের অন্যায়। তোমরা চার্চের পবিত্র শান্তি বহুদিন ধরিয়া ভঙ্গ করিতেছ। স্মিথ উচিত কাজই করিয়াছে। বেশ, এবারকার মতো বল তোমাদের স্মিথ দিবে। আর তোমাদিগে বলি, এমনভাবে বল খেলিবে যাতে চার্চের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। কী জানো, বাঙালি জাতি ডিসিপ্লিন জানে না, ইহা বড়ই আফসোসের কথা। স্মিথ তোমাদের ডিসিপ্লিন শিখাইবে। স্মিথ বলটা দিয়ে দিল। কিন্তু বাঙালি জাতি ডিসিপ্লিন জানে না, এ-কথাটা গায়ে কাঁটার মতো বিঁধে রইল। আমরা ছোট হলে কী হয়, এটুকু বুঝি স্বাধীন দেশের মানুষ আমরা, আমরা জওহরলাল নেহরু, গান্ধীর নাম শুনেছি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতা খবরের কাগজে দেখেছি, ওই পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে ওই আমাদের দেশ। তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী আমাদের ডাকছে। ওঠো, অস্ত্র হাতে নাও। নষ্ট করবার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। দিল্লির পথ আমাদের পথ। চলো দিল্লি। —এত বড় কথা, বাঙালি ডিসিপ্লিন জানে না ? আমরা নেতাজির বংশধর, আমাদের ডিসিপ্লিন শেখাবে কিনা ওই সাহেব ! ভেতরে-ভেতরে গরম হয়ে রইলাম।

দ্বিতীয় দিন বল ফের চলে গেছে চার্চের মধ্যে। এবার স্মিথ বল দিলই না, উলটে হকি-স্টিক দিয়ে তনুকে মারল। আমরা খেলা ছেড়ে সদলবলে চার্চের ভেতরে ঢুকলাম। ফাদার তখন অস্তগামী সূর্যের রাঙা আলোয় ওঁর সাদা গাউন পরে বাইবেল পড়ছিলেন। আমাদের নালিশ শুনে নীল চোখ তুলে তাকালেন। ধীরে-ধীরে বললেন, ব্রাদার স্মিথ ঠিক কাজটি করিয়াছে। এইভাবে উনি তোমাদিগে ডিসিপ্লিন শিখাইল। আমি ভাবিতেছি, কীভাবে স্মিথকে পুরস্কৃত করা যায়। তনুর কপাল ফুলে ঢোল হয়েছিল মারের চোটে। তনু রেগে গিয়ে বলল, তাহা যত ইচ্ছা আপনি ভাবিতে পারেন ফাদার। ব্রাদার আমাদিগের গায়ে হাত তুলিল কেন ? ফাদার তবুও বললেন, বাঙালিরা তো অমনিই। তোমরা তো মার খাইতেই জানো। ব্যস, শুধু এই কথাটির দরকার ছিল। ফাদারের সঙ্গে আর একটি কথাও নয়, আমরা ওঁকে নমস্কার করে সোজা সদলবলে বালির মোড়ে টুনুর কাপড়ের দোকানের চত্বরে যেখানে ছোটমামা সমিতির বড়দের নিয়ে মিটিং করছিল, সেখানে গিয়ে হাজির। মামা বলল, কী ব্যাপার রে নান্টু, আবার কোথায় গোলমাল পাকালি ? আমি রীতিমত গম্ভীর হয়ে ছোটমামাকে একটা স্যালুট দিলাম, বললাম, ফুয়েরার, (হিটলারকে সবাই নাকি ফুয়েরার বলত। আমরাও আমাদের নেতাকে ওই নামে ডাকতাম।) ব্যাপারটা হচ্ছে···

"মামা হাত তুলে বললে, সংক্ষেপে আর যতটা সম্ভব আবেগবর্জিত ভাবে। আমি আদ্যোপান্ত সব বললাম। ছোটমামা মুখ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। শুধু দু'বার আস্তে-আস্তে মুখে উচ্চারণ করলে, বাঙালিরা শুধু মার খাইতে জানে, বাঙালিরা শুধু মার খাইতে জানে। তারপর কান্তদাকে একান্তে ডেকে বললে, সবাইকে এখন যেতে বলো। এর একটা বিহিত খুব তাড়াতাড়ি করতেই হয়। নাউ, টেক ডাউন কান্ত। কান্তদা পকেট থেকে নোটবই বার করল। তারপর আমাদের দিকে তাকাল। আমরা চলে গেলাম। সেইদিনই গভীররাতে, রাতের অন্ধকার চিরে হুইসল্ বেজে উঠল। আমি, দাদা তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। কোথায় যেতে হবে জানি। ওলাইচণ্ডীতলার দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা কালীমন্দির আছে। আমরা ওখানেই গেলাম। গিয়ে দেখি সমিতির

বড় ছেলেরা আগেই উপস্থিত। সামনে শুকনো খড়কুটোয় আগুন জ্বলছে দপদপ করে। অদূরে টেবিল। টেবিলের ওপাশে একটা বেঁটে টুল। টেবিলের ওপর রক্তজবার একটা মালা-জড়ানো মা-কালীর একটা মূর্তি। ছোটমামা বললে, এবার আমাদের অ্যাকশনের পালা। আমি কালই আড়কাঠি পাঠিয়ে স্মিথ কখন কোথায় যায়, তার সংবাদ নিয়েছি। কখন ফেরে এটাও। তোমরা শুধু নিশ্চিন্ত থেকো, বদলা নেওয়া হবেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি অবশ্য আমাকেই করতে হবে। সবাইকে সব জানতে হবে, আমাদের সমিতি ওটা বিশ্বাস করে না। স্বয়ং ফুয়েরার আর দু-চারজন কর্তা-ব্যক্তি মাত্র মূল বিষয়টি জানবেন। নান্টু, তুমি সবচেয়ে ছোট ছেলে ক্লাবের, তোমাকে একটা ছোট কাজ দেওয়া হচ্ছে। বলতে গেলে, তোমার কাজটি ঠিকমতো করার ওপরই আমাদের সমস্ত প্ল্যান নির্ভর করছে। কালই আমরা বদলা নেব ঠিক করলাম। আগামী কাল সন্ধে ছ'টার সময় ব্যাণ্ডেল স্টেশনে ব্রাদার স্মিথ নামবে। ও তো পরশু কলকাতায় গেছে। নান্টু

তুমি একটা সাইকেল নিয়ে কাল বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ স্টেশনে চলে যাবে। যতক্ষণ স্মিথকে নিজের চোখে না দেখছ ততক্ষণ ওখানে থাকবে লোকেদের ভিড়ে মিশে। তোমাকে যাতে চিনতে না পারে সেই জন্যে এই সিংহের মুখোশটা দেওয়া হচ্ছে। ওটা মুখে সেঁটে নিয়ে চোখের ফুটো দিয়ে ঠিকমতো স্মিথকে শনাক্ত করে জোরে সাইকেল চালিয়ে মসজিদতলার বাঁ পাশ ও ডান পাশের পুকুরের কাছে নেমে অন্তত চার-চারবার হুইসল্ বাজাবে। তারপর আর দাঁড়াবে না। তোমার সাইকেলটা বাঁশঝাড়ের মধ্যে গুঁজে দিয়ে ওপাশের ঝুরি-নামা বটগাছে উঠে পড়তে পারো। উঠে পড়তে পারলে যে দৃশ্য দেখবে, আশা করি তা তুমি সহজে ভুলতে পারবে না। কই, নান্টু, কই, কাম ফরোয়ার্ড।

"ইয়েস ফুয়েরার, বলে আমি ভীষণ খুশিতে ছোটমামার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মামা একটা সিংহের মুখোশ, যা মেলায় কিনতে পাওয়া যায়, আমার দিকে এগিয়ে দিল আর একটা হুইসল্ও দিল। কান্তদা বললে, ছোটরা, যে যার বাড়ি চলে যাও। তোমাদের এর বেশি জানার দরকার নেই। এরপর আমাদের সভা, মানে বড়দের। আমরা সহ-অধিনায়ক কান্তদা'র ফরমানমতো যে-যার বাড়ি ফিরলাম। তারপরের দিনই অ্যাকশনের দিন। কখন বিকেল পাঁচটা বাজবে ওই ভাবনায় ভোর পাঁচটা থেকে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছি। ফুয়েরার বলেছে, এমন দৃশ্য দেখবে আশা করি তা খুব সহজে ভুলতে পারবে না। কী সেই দৃশ্য! কী সেই দৃশ্য! একটা অদ্ভুত কিছু নিশ্চয়ই যার সঙ্গে স্মিথ জড়ানো! কিন্তু কী হতে পারে? এই করে-করে সকাল, দুপুর ফুরোল।

"বাবা বললেন, হ্যাঁ রে, তোদের দুটোতে এত ভাব তো কোনওদিন দেখিনি। যখনই দেখি তখনই তো দেখি একজনের বুকের ওপর আরেকজন হাঁটু চেপে বসেছে। বলি, ব্যাপারটা কী? সবসময় শলাপরামর্শ, সব সময় গুজুরগুজুর, ফুসুরফুসুর। সত্যি কথা বল। হুঁ, অত কাঁচা পার্টি আমাদের পাওনি। খবর যদি 'লিক' হয় তবে যে ধোলাই কপালে জুটবে···। তা ছাড়া সব থেকে যেটা বিচ্ছিরি, ছোটমামা সঙ্গে-সঙ্গে সমিতি থেকে 'স্যাক' করে দেবে। সেটি হচ্ছে না। অতএব, ঠিক করলাম বাড়িতে এখন আর বেশি থাকা ঠিক নয়। বরং বাড়ির পেছনে যে ফলসা গাছ আছে, তাতে চড়ে পড়াশুনো চালাই। দাদা বললে, সেই ভাল। তুই ফলসাগাছে চড়, আমি পাশের পেয়ারা গাছে। পড়া? কী করে হবে? মনশ্চক্ষে ভাসছে অ্যাকশনের কথা। আর ভেতরে জোর করে চেপে রাখা উত্তেজনা মুহুর্মুহু বাইরে যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাঙালিরা মার খাইতে জানে, বাঙালিরা মার খাইতে জানে···ওঃ, ওই পাঁচটা বাজল চার্চের পেটা ঘণ্টায়।

"আমি সাঁত করে বনের ভেতরে রাখা মুখোশটা টেনে বার করলাম। বুক-পকেটে রাখা হুইসলটা ঠিক আছে কি না ভাল করে দেখে নিলাম। তারপর শোঁশোঁ করে সাইকেল চালিয়ে এক নিশ্বাসে একেবারে ব্যাণ্ডেল স্টেশনে। দাঁড়িয়ে আছি···দাঁড়িয়ে আছি সময় আর যেন ফুরোতে চায় না। এখনকার মতো অত যাত্রীও নামত না তখন স্টেশনে। যাত্রী নামত মেরেকেটে দশ-বারোজন। এখন যেমন রিকশা কাতারে-কাতারে, তখন তো তেমন ছিল না। মেরেকেটে দু'খানা রিকশা আর মিয়াজান-কোচোয়ানের ঘোড়ার গাড়ি। তা সেটিও আজ নেই। থাকলে হয়তো মুশকিল হত। মিয়াজান কোচোয়ান আমাকে বিলক্ষণ চেনে। কতদিন ওর গাড়ির পেছনে চাপার জন্যে চাবুক খেয়েছি। তার একটা কাটা দাগ এখনও কপালে আছে। মুখোশটা মুখে এঁটে উত্তেজনায় শরীরটাকে টান-টান করে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। উঃ, কী অপমান! বলে কিনা বাঙালিরা মার খাইতে জানে! বাঙালির তুমি কতটুকু জানো ফাদার ওয়ালেশটন! বাঙালির ছেলে আজ ব্যাঘ্রে-বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়—বোঝো কথাটার মানে? না বুঝলে আজ হাড়ে-হাড়ে বুঝবে!

"আমার ছোটমামা আর বোমা দুটো একই জিনিস। ঠিক দেখছি তো! আরও একবার ভাল করে দেখলাম। না হয় একটু কাছেই যাই না। গেলাম, গিয়ে দাঁড়ালাম হাত-পঞ্চাশেকের মধ্যে। না, কোনও ভুল নেই। ব্রাদার স্মিথ ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে আসছে। ওর মুখে হাসি আর ধরে না। নে, হেসে নে আরও মিনিট-পাঁচেক। তারপর তোর জন্যে যে কী জিনিস অপেক্ষা করছে, তা তুইও জানিস না, আমিও জানি না। ব্যস, কেল্লা ফতে। লাফিয়ে সাইকেলে সওয়ার হয়ে হুশ করে একদমে একেবারে মসজিদতলা। মসজিদতলার উঁচুতে, টিলার মতন জায়গাটাতে আজানের সুর ভেসে আসছে। দুর্গের মতো দেখাচ্ছে মসজিদটা। অন্য সময় এখানে একা এলে খালি ভয় হত কী করে ফিরে যাব প্রাণ হাতে করে! কিন্তু আজ সব অন্যরকম। কোথায় ভয়! কিসের ভয়!

"দু'পাশের দু'পুকুরের পাঁচিলের দিকে তাকালাম আর হুইসল্ বার-পাঁচেক বাজিয়ে শাঁ করে অদূরে বাঁশগাছের গোড়ায় সাইকেলটা গুঁজে দিয়ে তার থেকে হাত-পঞ্চাশেক দূরে ঝুরি-নামা বটগাছটায় উঠে বসলাম। এইসব গাছেফাছে ওঠা এসব নস্যি ছিল আমাদের কাছে। বোম্বেটে ব্যায়াম সমিতিতে প্রথম ট্রেনিংই দেওয়া হত এটা। সব থেকে ছোট ছিলাম আমি, তবু আমাকেও দড়িছাড়া নারকেল গাছে ওঠার ট্রেনিং-এ পাশ করতে হয়েছিল। এ-গাছটার সুবিধে হচ্ছে এই, যদি কেউ টেরও পায় আমি এখানে আছি, আমার নাগালের মধ্যেই আছে প্রকাণ্ড লম্বা ঝুরি, সেই ঝুরিটা ধরে একটা লাফ দিতে পারলেই একটা বড় জঙ্গলের মধ্যে পড়ব, আর যদি জঙ্গলের মধ্যে

গিয়ে একবার পড়তে পারি, তা হলে আমাকে পায় কে ! ছোটমামার ঠিক নজর আছে। মামা ঠিক গাছটি আমার জন্যে শনাক্ত করে রেখেছে। বাপ রে,কী চোখ ! সাধে কি আর লিডার হয়েছে ! তা হলে তো যে-সে লিডার হতে পারত !

"বটগাছের মগডালে বসে চক্ষু চড়কগাছ। এতটা ভাবতে পারিনি। একটা বেশ ভাল বন্দোবস্ত যে হয়েছে, সেটা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু এতটা ভাবিনি। ঠিক আমার গাছটা থেকে দু'শো হাত দূরে দু'পাশের পুকুরপাড়ে আমাদের বোম্বেটে ব্যায়াম সমিতির সমস্ত ছেলেরা। কেউ আর বাকি নেই। অবশ্য বড়রা বাদে। ছোটমামা, কান্তদা বা গজাদা, ওদের দেখতে পেলাম না। নিশ্চিত কোথাও আছে। কিন্তু আমি ওদের আঁতিপাতি করে চোখ পেতেও এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি না। এমন নিশ্চয়ই হতে পারে, ঠিক মুহূর্তে হয়তো মাটি ফুঁড়ে 'হারে-রে-রে' করে মাথায় পাগড়ি আর হাতে লাঠি নিয়ে আসরে নেমে পড়বে। কিন্তু ছোটমামা গেল কোথায় ? ছোটমামা না কাল বলেছিল আসল গুরুত্বপূর্ণ কাজটা আমিই করব ! তার কী হল ? হঠাৎ দেখলাম কান্তদাকে। হুঁ, ঠিক চিনেছি। যতই মুখে কালিঝুলি মাখুক, ওই হাঁটা, ওই চলা, এ কান্তদা না হয়েই যায় না। কান্তদা একটা গাছের ডাল বেয়ে নেমে হেঁটে গেল বুনো জায়গাটা দিয়ে। কাকে যেন ইশারা করে ডাকল। তাকে কী যেন বলল। তারপর কোথা থেকে বেরোল একটা সাইকেল। ও সাইকেলটা নিয়ে পাঁচিলের ওপাশে ফেলল। পাঁচিলের ওপাশে ঠিক জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে ছিল আর-একজন, এখান থেকে দেখা গেল না। সে সাইকেলটা নিয়ে শোঁশোঁ করে প্যাডেল করে বালির মোড়ের দিকে চলে গেল। কান্তদা মসজিদতলা ঠিক যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, সেখানে একা চুপটি করে দাঁড়াল। হঠাৎ কী জানি চারিদিক কেমন

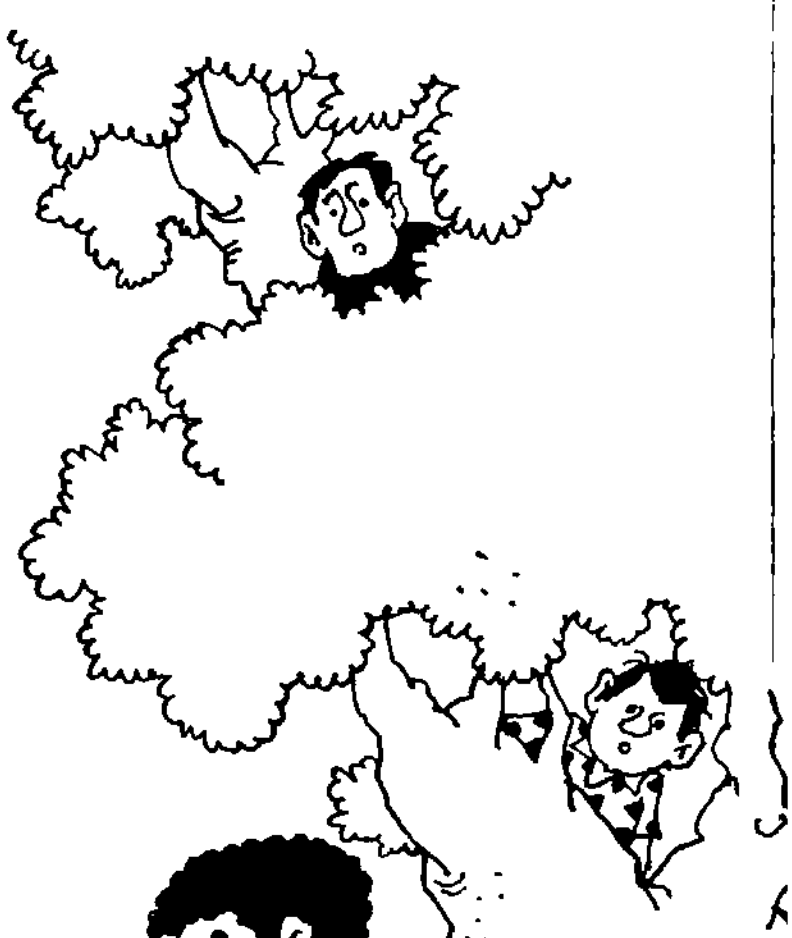

স্তব্ধ হয়ে গেল। চমকে চেয়ে দেখি, দুলকি চালে একটা রিকশা আসছে। স্মিথ নাকি ? বুকের ভেতরটা উত্তেজনায় ধড়াস-ধড়াস করে উঠল। হ্যাঁ, স্মিথই তো ! ওই তো স্মিথ ! অবিকল স্মিথ ! হঠাৎ 'এই রিকশা থামা' বলে বিকট একটা হুঙ্কার আর তারপরেই দেখি কোনও গুপ্ত জায়গা থেকে ছোটমামা সাপের মতো সড়াত করে বেরিয়ে এসে একটা থান ইট নিয়ে স্মিথের দিকে এগিয়ে গেল, মারলে সপাটে মুখে, মনে হল স্মিথ ককিয়ে 'মাই গড' বলে চিৎকার করে উঠে দড়াম করে রাস্তায় পড়ে গেল। রিকশাঅলা ওরে বাপ রে, খুন হো গিয়া, খুন হো গিয়া বলে পরিত্রাহি চিৎকার করতে-করতে রিকশা ফেলে ছুট। ভয়ে আমার চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোনওরকমে চোখ খুলে দেখি, ছোটমামা কাছে এগিয়ে গেল স্মিথের কাছে, তারপর বলল, বাঙালিরা শুধু মার খাইতেই জানে না, মার দিতেও জানে। বাচ্চা ছেলেদের বল ঢুকে গেছে চার্চের মধ্যে। সেটা ইচ্ছে করে লুকিয়ে রেখে হকি-স্টিক দিয়ে আমাদের সমিতির ছেলেকে পেটানো ! যাও, প্রাণে মারলাম না। তবে যা মারলাম এ-জীবনে তুমি শতচেষ্টা করলেও ভুলতে পারবে না। বলেই মামা হুইসল বাজিয়ে একেবারে হাওয়া।

"রাতের দিকে দাদা শম্ভু ময়রার দোকানে গিয়েছিল দিদিমার মিষ্টি কিনতে। দাদা চুপিচুপি আমাকে কাছে ডেকে বললে, খবরটা আর চাপা নেই রে। চারিদিকে চাউর হয়ে গেছে। কী করে হল কে জানে। মিষ্টির দোকানে ময়রা মশাইয়ের সঙ্গে বসে যারা তামাক খায়, তারা সব গুজগুজ করে আলোচনা করছিল। সবাই বলছিল, মেরেছে, বেশ করেছে। তবে ষণ্ডাটাকে না জেলে ধরে নিয়ে যায়। ওটার বড্ড বাড় বেড়েছে। ওটার জেল-হাজতই উৎকৃষ্ট জায়গা। বোঝো একবার। মামা বাঙালি জাতির অপমানের শোধ নিচ্ছে আর তোমরা কোথায় তার পাশে এসে দাঁড়াবে তা নয়, উলটে সাহেবদের পক্ষে গিয়ে দাঁড়াচ্ছ। এদের কস্মিনকালেও কিছু হবে ?"

"তারপর ?"

"তারপরের দিন ইস্কুলে গেছি। আমি খানিকটা নির্ভয়। আমি তো আর অ্যাকশনে ছিলাম না। ঘটনাটা জানি মাত্র। আমাকে কেউ দ্যাখেনি। শুধু নিরীহ একটা হুইসল বার-পাঁচেক বাজিয়েছি মাত্র। বড়রা বাজাতে বলেছিল, তাই বাজিয়েছি। এইভাবে নিজের কাজের কৈফিয়ত মনে-মনে আওড়াচ্ছি। তার মানে ততটা ভয় না থাকলেও ভেতরে-ভেতরে রীতিমত ঘাবড়ে গেছি। সবাই এসেছে, এমনকী যেসব ছেলে বছরে একবার ইস্কুলে আসে, নোটিস দিয়ে তাদেরও আনা হয়েছে। এরকম অনাসৃষ্টি কাণ্ড ফাদারের এতখানি জীবনে এই প্রথম ঘটল। অনেককেই দেখছি, কিন্তু আমাদের বোম্বেটে ব্যায়াম সমিতির বড়দের দেখছি না। হঠাৎই দেখলাম ছোটমামাকে। যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। ওই তো ফুয়েরার, অ্যাকশনের রিং-লিডার। সবাই আড়ালে 'ষণ্ডা' বলে মামাকে ডাকে। কুখ্যাত বোম্বেটে ব্যায়াম সমিতির নাম কি ফাদারের কানে গিয়ে পৌঁছয়নি ? কে থান ইট ছুঁড়ে মেরেছে স্মিথকে, তা কি এখনও অজানা আছে কারও ? এমনিতে ছোটমামার ডোন্ট কেয়ার ভাব সব সময়, কিন্তু এখন যেন একটু বেশি, চলছে-ফিরছে বেশ একটু গর্ব নিয়ে, কিন্তু আমি জানি ভেতরে-ভেতরে ছোটমামার হয়ে গেছে ! যদি ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়, যদি জেলে নিয়ে যায় ধরে, এ ভয়ও কি খাচ্ছে না ! তা আবার হয় নাকি !

"খানিক পর ঘণ্টা বাজল। ফাদার এলেন। অন্যদিন হাসিখুশি থাকেন। আজ বেশ গম্ভীর। প্রেয়ার ক্লাস হল। অন্যদিন হল্লাগুল্লাব ঠেলায় কানপাতার জো থাকে না। আজ যেন কী দশায় পেয়েছে সকলকে। মাস্টারমশাইরা পর্যন্ত কথা বলছেন নিচু পর্দায়। স্পষ্ট বুঝলাম, আজ ফাদার একটা হেস্তনেস্ত করবেন। পরপর দুটি পিরিয়ড চলে গেল। ক্লাস যেমন চলার তেমনিই চলতে লাগল। বংশীবাবুর জায়গায় বংশীবাবুই এলেন। রমণীবাবু যেমন প্রত্যেকদিন বলেন, মালা আনছস্ ? ফুল আনছস্ ? যেই বলি, না স্যার, উনি বিরক্তস্বরে বলেন, তাইলে, বাইরাইয়া যা, বাইরাইয়া যা। আর আমরাও বেরিয়ে পড়ি। করিডরে-করিডরে ঘুরি। সেসব হয়ে গেল, হঠাৎ টিফিনের পর দাদা ব্যস্তসমস্ত হয়ে কোথা থেকে এসে বলল, ফুয়েরার ডাক পড়েছে ফাদারের ঘরে। এই নান্টু যাবি ? ক্লাস নাইনের ঘরে একটা বড় সাইজের ফুটো আছে দরজায়। ওটা কেউ জানে না। আমি ছুরি দিয়ে করে রেখেছি। এটাতে চোখ রাখলে সব দেখা যায়, শোনাও যায়, দরজার কাঠ খুব পাতলা। আমি পরীক্ষা করে জেনেছি। চল, যাই।

"সেদিন ক্লাস নাইনের ঘরে দরজার ফুটো দিয়ে যে-দৃশ্য দেখেছিলাম, আর যা কানে শুনেছিলাম, এ-কথা হলফ করে বলতে পারি, সেরকম অভিনব বিচার আর এ জীবনে কখনও দেখিনে, শুনিওনি। পরে, বড় হয়ে অনেক বড়-বড় বিচারসভা দেখেছি, পড়েছিও কত, কিন্তু সেদিনকার কঠিন-কঠিন প্রশ্নের উত্তরে ছোটমামা যে নির্ভীক উত্তর দিয়েছিল তেমনটি আর দ্বিতীয় দেখলাম না। ছোটমামাব কাজটাকে প্রশংসা করছি না, কাজটা সত্যিই অন্যায় হয়েছিল কিন্তু সাহসেরও জীবনে একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে, সেটাকে অগ্রাহ্য করা যায় না।

"আমি ফুটোতে চোখ লাগিয়ে অবাক হয়ে শুনলাম ফাদার বলছেন, তুমি স্মিথকে মারিয়াছ ? সত্য বলো। পবিত্র যিশুর নামে বলো।

"ছোটমামা ঝকঝকে চোখে নির্ভুল যে উত্তর দিল, তা যেমন চমকপ্রদ তেমনি সাহসী আর সত্য তো বটেই, নির্মম, অতি নির্মম সত্য।

"ছোটমামা বলল, পবিত্র যিশুর নামে বলিতেছি ফাদার, আমি উহাকে মারিয়াছি। সে উত্তর শুনে এক মুহূর্তের জন্যে ফাদার একটু কেঁপে উঠলেন, ওঁর নীল চোখে স্পষ্ট দেখা গেল বিদ্যুৎ, উনি ঠোঁট টিপে চাপা স্বরে বললেন, উহার রক্তপাত ঘটিয়াছে। তাহা তুমি দেখিয়াছ ? ছোটমামা তবু অদম্য ও নির্ভীকভাবে বলল, হ্যাঁ, উহার প্রচুর রক্তপাত ঘটিয়াছে তাহা আমি দেখিয়াছি।

"ফাদার দ্বিতীয়বার চমকে উঠলেন। ফের বললেন, তুমি জানো যিশু রক্তপাত সমর্থন করেন না ! ছোটমামা তেমনি অদম্য ভঙ্গিতে বলল সঙ্গে-সঙ্গে, কিন্তু যিশুরও রক্তপাত ঘটিয়াছিল। ফাদার টেবিলে রাখা, বিশেষ করে ওর জন্যে রাখা শঙ্কর মাছের চাবুকের দিকে একবার যেন হাত বাড়ালেন। তারপর কী ভেবে হাতটা সরিয়ে নিলেন। আবার তাকালেন তাঁর নীল চোখে ছোটমামার চোখের দিকে। ছোটমামা চোখ নিচু করল না। ও সমানে তাকিয়ে রইল ফাদারের দিকে নির্নিমেষে। ছোটমামা হঠাৎ বলল, আর কিছু বলবে ফাদার ? ফাদার কিছু বললেন না। নীরবে আঙুল তুলে দরজা দেখিয়ে দিয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বললেন, আসেন।

"ছোটমামার কিছু হল না। তারপরের দিনও না। তারপরের দিনও না। কোনদিনও না। শুধু এই ঘটনার কয়েকদিন পর ছোটমামাকে আর কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। বছর-দেড়েক পর লোকে বললে, জব্বলপুরের পাহাড়ে ছোটমামাকে নাকি দেখে গেছে ধুনির বুকে ত্রিশূল গুঁজে মহাধ্যানে মগ্ন।"

ছবি : দেবাশিস দেব

স্বর্গদ্বার

শিবতোষ ঘোষ

স্টেশনে যমদূত এসে হাজির হল নিতাইদা'র সামনে। নিতাইদা'কে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম নিতাই বকসি ?"

নিতাইদা বলল, "হ্যাঁ।"

"তুমি গোপালপুর থেকে আসছ ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার বাবার নাম বৃন্দাবন বকসি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ! গলায় মোটা মালা ছিল, শোবার আগে রোজ হরিনাম জপ করত। আর কিছু বলতে হবে ?"

যমদূত বলল, "না, চলো !"

"কোথায় ?"

"কোথায় মানে ! তুমি বুঝতে পারছ না ? আঁকুপাঁকু হচ্ছে না তোমার ভেতরটা ? নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে না ?"

"সে তো সব-সময়ই হয়।"

"তোমার পরলোকে যাবার নোটিস আছে, এই দ্যাখো, চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিট গতে..."

"বাঃ আমার চারটে চল্লিশে ট্রেন !"

"তোমার গাড়ি-ঘোড়ায় আর দরকার নেই, চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিটে তোমার মৃত্যু। চিত্রগুপ্ত একেবারে লাল কালিতে দাগ মেরে নোটিস ছেড়েছে।"

বলেই যমদূত লাল দাগ-দেওয়া জায়গাটা পড়তে লাগল, "শ্রীনিতাই বকসি, পিতা স্বর্গত বৃন্দাবন বকসি, নিবাস..."

নিতাইদা প্রচণ্ড ধমক দিল, "চুপ করো, আমি পয়সা গুনছি ! আজকাল খুচরোর খুব অভাব চলছে, ঠিক-ঠিক খুচরো না দিলে টিকিট দেবে না !"

"কী মুশকিল, তোমার পয়সা গুনে কী হবে, তুমি যাচ্ছ যমপুরীতে, সেখানে তোমার সঙ্গে পয়সাও যাবে না, টিকিটও লাগবে না।"

নিতাইদা যমদূতের ওপর রেগে গেল, "মামা বাড়ি আর কি ! আমি গরমে ঘেমে-নেয়ে আধ ঘণ্টা ধরে লাইন দিলাম, এখন বলছ টিকিট কাটব না। তা হলে আধ ঘণ্টা আগে বললেই পারতে !"

"তখন তুমি বলতে ট্রামে-বাসে চিঁড়ে-চেপটা হয়ে ঝুলতে-ঝুলতে এসেছি, আমাকে বাসে ওঠার আগে বলতে পারতে !"

নিতাইদা বলল, "বলবই তো, একশোবার বলব ! সময় থেকে জানলে কোনও নিরালা জায়গায় বসে শেষ সময় একটু হরিনাম করে নিতাম !"

যমদূত হেসে বলল, "সেজন্যই তো এলাম, এখানে এত কষ্ট করে লাভ কী ? চলো, আমার সঙ্গে চলো, সেখানে নিরালা জায়গাও পাবে, অঢেল সময় পাবে, যত খুশি হরিনাম করতে পারবে !"

নিতাইদা বলল, "লক্ষ্মী ভাইটি, সময় যখন আছে তখন একটু দাঁড়াও, ফোকরে হাত ঢুকিয়েছি,টিকিটটা কেটে নি' ! যাওয়া না হলে

অন্যভাবে চালিয়ে দেব, টিফিন-খরচটা তো উঠে আসবে, যা খিদে পাচ্ছে !"

নিতাইদা চিৎকার করল, "কী দাদা, কী করছেন ? তাড়াতাড়ি হাত চালান !"

যমদূত বলল, "দেখো, তখন যেন বোলো না, এত কষ্ট করে যখন টিকিট কাটলাম, তখন ট্রেনে চড়ি, ট্রেনে যখন হুড়োহুড়ি করে উঠেছি তখন বাড়ি যাই ! আর তোমাদের বাড়ি যাওয়া মানে তো দেড় ঘণ্টার ট্রেনে দু'ঘণ্টা লেট !"

নিতাইদা তাড়াতাড়ি বলল, "না-না, অত লেট সব মেল-এক্সপ্রেসে হয়, আমার তো লোক্যাল ট্রেন, এতে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের বেশি লেট হয় না।"

২

নিতাইদা কিন্তু মনে-মনে ঠিক করল, বাড়ি যদি একবার কোনওরকমে যেতে পারি, তা হলে আমাকে আর পায় কে ! অন্তত হাত-পা ধুয়ে, খাওয়াদাওয়া সেরে···, নিতাইদা দু' কিলো হিমসাগর আম কিনেছে, আম দিয়ে ভাত মেখে খেতে তার যে কী ভাল লাগে !

হঠাৎ তার একটা বুদ্ধি এসে গেল মাথায়, সাবিত্রী-সত্যবানের গল্পটা মনে পড়ে গেল। সে তার স্ত্রী কাঞ্চনবালাকে একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবে, আরে সাবিত্রী একটা অজ গাঁয়ের মেয়ে, তখনকার দিনে কীই-বা এমন লেখাপড়া জানত, কাঞ্চনবালা বরং ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে, আর যা ঝগড়ুটে···

কাঞ্চনবালা যমরাজের সঙ্গে কী-কী পয়েন্টে তর্ক করবে মনে-মনে একবার আওড়ে নেয়।

"আমার শাঁখা-সিঁদুর যেন অক্ষয় থাকে !"

"তথাস্তু।"

"স্বামী মারা গেলে ওগুলো অক্ষয় থাকে কী করে ?"

হিহি হাসল নিতাইদা, ওদের হারাতে কী !

যমদূত ঝাঁকুনি দিতে সে শেষ মুহূর্তে একটা মোক্ষম যুক্তি ছাড়ল, বাড়িতে তার দুই ছেলে একেবারে অবোধ শিশু, তারা দুজনেই অসুস্থ।

"এই দ্যাখো, ওদের জন্যে ওষুধ কিনে নিয়ে যাচ্ছি!"

পকেট থেকে ট্যাবলেটগুলো বের করে দেখাল।

"বলো, এখন কী বলবে? তোমরা হলে গিয়ে ওপরের লোক, একটু ধর্ম-টর্ম তো মানবে নাকি..."

সত্যিকারের ভাবনায় পড়ে গেল যমদূত। ওষুধের অভাবে ছেলে দুটো যদি না বাঁচে, অবশ্য ওষুধ খেলেই যে বেঁচে যাবে, এমন কথা নয়। তবু বাবা-মা'র আশা তো। তারা তো আর জানছে না ওষুধগুলো খাঁটি না ভেজাল!

যমদূত ভাবল, ছেলে দুটোরও কি লাল দাগ পড়ে যাবে দু-একদিনের মধ্যে, ওইটুকু কচিকাঁচা বাচ্চা! এর ওপর স্বামী-পুত্র মারা গেলে নিতাই বকসির স্ত্রীও কী আর বাঁচবে, তিন-তিনটে পাহাড়-প্রমাণ শোক!

কিন্তু একসঙ্গে এত মৃত্যু যদি খাতায় না থাকে, শেষকালে চিত্রগুপ্তই তাকে চোখ রাঙাবে, বলবে, "উল্লু, ঘাড় টানলে মাথা আসে তুই জানিস না!" তখন তাকেই কোথাও অজ জায়গায় ট্রান্সফার করে দেবে!

ভেবেচিন্তে চিত্রগুপ্তকেই টেলিফোন করার সিদ্ধান্ত নিল যমদূত। এত বড় জটিল ব্যাপারে তার মাথা গলানোর দরকার নেই। মাথার ওপরে কর্তাব্যক্তিরা আছেন, তাঁরা যা হুকুম করবেন, সে সেইমতো কাজ করবে।

"হ্যালো!"

তাদের টেলিফোন-সিসটেম আলাদা। লাইন পেতে কোনও কষ্ট নেই। মুখে শুধু একবার হ্যালো বলতেই চিত্রগুপ্ত ফোন তুলে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

"আজ্ঞে, আমি। ছাপ্পান্ন নম্বর যমদূত বলছি।"

"হ্যাঁ, কী হল, নিতাই বকসিকে এখনও আনছ না কেন?"

"আজ্ঞে, একটু ঝামেলা হয়েছে।"

ঘাড় চুলকোচ্ছে যমদূত।

"ঝামেলা! কী ঝামেলা?"

"আজ্ঞে, নিতাই বকসিকে তুলে নিলে তার মর-মর দুই ছেলে, রুগ্ণা স্ত্রী..." সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল যমদূত।

যমদূত বলল, "হ্যালো, দয়া করে খাতা দেখে একটু বলবেন সপ্তাহখানেকের মধ্যে নিতাই বকসির স্ত্রী-পুত্রের নামে..."

"হ্যাঁ, তা হলে তুইও এ-সপ্তাহটা থেকে যাস, কেমন? না, ওসব চলবে না! তোদের দেখছি মর্ত্যে গেলে আর আসতে ইচ্ছে করে না!"

কথাটা মিথ্যে নয়। পরলোকে সেই মান্ধাতা আমল থেকে যে কতগুলো জিনিস চলে আসছে, তার কোনও রদবদল নেই। সেই নন্দনকানন, সেই দুধসাগর, সেই নীলকান্তমণি! ইহলোকে এখন কী সুন্দর রংবাহারি টিভি চলছে, কী দারুণ-দারুণ বিজ্ঞাপন! আর তাদের, সেই পুরনো সাদা-কালো, তাতে হয় বক্তৃতা না হলে খবর।

আকাশবাণী, খবর পড়ছি সূর্য দেব। আজকের প্রধান-প্রধান খবর হল, দেবরাজ ইন্দ্র নরকের স্থান বাড়ানোর জন্য তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা মঞ্জুর করেছেন।...মর্ত্যে দেবভাষার হেনস্থার বিরুদ্ধে মহর্ষি ব্রহ্মা প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বাঘ-ছাগল খেলায় বালক বিভাগের সিঙ্গলসে কার্তিক চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

চিত্রগুপ্ত চালাক, সেও নিজের ঘাড়ে দোষ রাখতে চাইল না। সামান্য একটু গণ্ডগোল হয়ে গেলে সিংহাসন টলমল। আর যমরাজ সিংহাসনচ্যুত হলে তাকে আর নবাবি করতে হবে না।

চিত্রগুপ্ত যমরাজকে ফোন করল। জিজ্ঞেস করল, "ছাপ্পান্ন নম্বর যমদূত মর্ত্যে গিয়ে এই কেস বাধিয়েছে, এখন তা হলে কী করা যায়?"

যমরাজ বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। লাইনটা হঠাৎ এরকম গোলমাল করছে কেন বলো তো?"

চিত্রগুপ্ত বলল, "তা হলে মিছিলে-মিছিলে ঠিক ঠোকাঠুকি লেগেছে। আজ ময়দানে কী-কী দুটো পার্টি একইসঙ্গে নাকি মিটিং ডেকেছিল।"

যমরাজ বললেন, "তা হলে একটু দাঁড়াও, মিছিলটা যেতে দাও।"

"কিন্তু মহারাজ,এদিকে আর সময় নেই, মাত্র এক মিনিটের সাড়ে তিনশো ভাগের এক ভাগ... তাও ইন্ডিয়ান টাইম বলে। আমাদের এক্ষুনি সিদ্ধান্ত নিতে হবে!"

"তা হলে জোরে জোরে বলো। বলো,খাতায় কী লেখা আছে?"

"আজ্ঞে, খাতায় তো শুধু নিতাই বকসির নামে লাল দাগ।"

"তা হলে বাচ্চা দুটো, কী নাম বললে যেন?"

"আজ্ঞে নুটু-পুটু!"

যমরাজ বললেন, "আচ্ছা অত চিন্তার কী আছে, নুটু-পুটুদের অসুখ সারিয়ে দাও না!"

"আজ্ঞে, প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম, কিন্তু ওদের ডাক্তার ভুল চিকিচ্ছে করে-করে অসুখটাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যে, ওদের ডাক্তারের সেই ভুল ওষুধই এখন খাইয়ে যেতে হবে।"

"আরে না, না, ভুল চিকিৎসায় কখনও অসুখ সারে! তুমি বরং আমাদের ডাঃ অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে এ-ব্যাপারে পরামর্শ করে নাও! দ্যাখো, তিনি কী বলেন?"

"হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ?"

"আজ্ঞে, খু-উ-ব অল্প!"

দলে-দলে মারপিট লেগে গেল নাকি? পৃথিবীর এইসব বাজে দাপাদাপি মাঝখানের লেয়ার ভেদ করে অনেক সময় স্বর্গে এসে পৌঁছয়। এমনকী, দু-একবার স্বর্গের সব যন্ত্রপাতিগুলোও অচল করে দিয়েছিল।

চিত্রগুপ্ত জোরে চেঁচিয়ে বলল, "কিন্তু অশ্বিনীকুমার তো এখানে নেই, উনি এখন আমেরিকায়।"

"কেন, আমেরিকায় কেন?"

"ওরাই তো এখন বড়-বড় সব ডাক্তার-বিজ্ঞানীদের কিনে নিচ্ছে!"

"সর্বনাশ, তা হলে আমাদের এখানে?"

"না উনি সেখানে একটা সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গেছেন, উনি ফিরে আসবেন।"

"তাই বলো, আমি তো..."

"কিন্তু মহারাজ আর যে মাত্র এক মিনিটের পাঁচশো চুরাশি ভাগের..."

"তা আমি কী করব, আমার তো মাথায় কিছু আসছে না!"

"আজ্ঞে..."

"এই সময়ের মধ্যে নিতাই বকসিকে কি তার বাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে?"

"একেবারেই অসম্ভব! ট্রেন ছাড়তেই দশ মিনিট লেট হবে মাইকে অনবরত বলছে।"

"তা হলে লাইনটা দয়া করে ছাপ্পান্ন নম্বর যমদূতকে একবার দাও। দেখি তার সঙ্গে কথা বলে।"

যমরাজ বললেন, "হ্যালো ছাপ্পান্ন !"

"হ্যাঁ, বলছি !" ভয়ে কাঁপছে যমদূত। স্বয়ং মহারাজ।

"নিতাই বকসি এখন কোথায় ?"

"আজ্ঞে, ট্রেনের মধ্যে।"

"তা হলে তো ভালই হল, যাও, প্রাণবায়ু টেনে নাও !"

"আজ্ঞে..."

"কী আজ্ঞে-আজ্ঞে করছ, যাও, সময় নেই !"

"কিন্তু মহারাজ, কোন্‌দিক দিয়ে টানব, এত ভিড় যে..."

"ভিড় হঠাও, জলদি হঠাও !"

"কিন্তু, আজ্ঞে, হঠাই কেমন করে, একসঙ্গে তাল-পাকানোর মতো জড়ানো লোক, একজনের গায়ে হাত লাগলে বাকিগুলোও সব অক্কা পাবে।"

"কেন গায়ে হাত লাগলে অক্কা যাবে কেন ? এক-আধজন হয়তো একটু ছিটকে পড়ে যেতে পারে !"

"আজ্ঞে, ওদের প্রাণপাখি যে শুধু চিঁচিঁ করছে। এ-অঞ্চলে আমাদের সবদিন ডিউটি থাকলে খুব ভাল হয়, এখানকার লোকগুলো মরার আগে থেকে মরে থাকে, ঝরা ফুলের মতো, কুড়িয়ে নিলেই হল।"

যমদূত বলছে, "হুজুর বিশ্বাস করবেন না, এদের প্রাণপাখির ওজন আমাদের টিকটিকির ডিমের চেয়েও ছোট।"

চিত্রগুপ্ত জানাচ্ছে, আর এক মিনিটের এগারোশো ভাগের এক ভাগ মাত্র সময় অবশিষ্ট আছে। সঙ্গে-সঙ্গে মহারাজ চিৎকার করে উঠলেন, "তা হলে আমাকেই কি শেষ পর্যন্ত যেতে হবে ?"

কিন্তু যমরাজের ইহলোকে যাওয়া যমপুরীর ইতিহাসে আদৌ সুখের ঘটনা নয়।

মনে পড়ে যেতে চিত্রগুপ্ত জানাল সেই পুরনো দিনের সাবিত্রীর গল্পটা, "এখন আরও শিক্ষিত হয়েছে সকলে, আরও চালাক হয়েছে। এখন আপনাকে পেলে শুধু পরমায়ু নয়, গাড়ি-বাড়িও আদায় করে ছাড়বে। নিউ আলিপুরে ফ্ল্যাট চেয়ে বসলে আপনি মহা ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন !"

যমরাজ শুনে হম্বিতম্বি করে বললেন, "আরে ছাড়ো, ছাড়ো, সে ছিল সত্যযুগের সাবিত্রী, কত নিষ্ঠা ছিল তার। আর এ হল নিতাই বকসি! লোকটা সারাজীবনে কতগুলো মিথ্যে বলেছে যেন ?"

চিত্রগুপ্ত খাতা দেখে বলল, "আজ্ঞে সতেরোশো বাহান্ন।"

যমরাজ একটা হুঙ্কার ছাড়লেন। টেলিফোনেই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে ত্রিভুবনে থরহরি পড়ে গেল। তিনি টেলিফোন রাখলেন দুদ্দাড় করে, মনে হল যেন বোটানিক্যাল গার্ডেনের বটগাছটাই উপড়ে পড়ল কানের কাছে।

গদাটা টেনে নিয়ে কাঁধে ফেললেন, "হুম !"

যমরাজ দরজা খুলে তালগাছ থেকে কাঁদি নামানোর মতো পা দুটোকে খালি বাতাসে ছেড়ে দিলেন, তরতর করে মর্ত্যে নামতে লাগলেন মহারাজ।

এটাই হল মর্ত্যধামে যমরাজের দ্বিতীয় পদার্পণ।

৩

যমরাজ যমদূতকে নিয়ে আস্তে করে ঢুকে গেলেন ট্রেনের মধ্যে। যমদূত আঙুল বাড়িয়ে চিনিয়ে দিতে তিনি টুঁই করে একটা চাঁটি মারলেন নিতাইদার মাথায়।

নিতাইদা ওতেই কুপোকাত। পড়ে গেল। প্রচণ্ড চেঁচামেচি হচ্ছে। হঠাৎ দেখল একজন কালো জামা-পরা লোক কতকগুলো লোকের পেছনে-পেছনে ছুটছে।

যমরাজ জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, এখানে তোমাদের আরও একজন কেন ? একই জায়গায় দুজনের ডিউটি ? চিত্রগুপ্তের মাথার কোনও ঠিক নেই দেখছি !"

"আজ্ঞে না, উনি হলেন চেকার। উনি এলেন বলে তো ট্রেনে উঠে নিতাই বকসিকে খুঁজে বের করা গেল।"

"চেকার, সে আবার কী ? এখানে আসতে-আসতে 'বেকার' কথাটা খুব শুনছিলাম, তার ভাইটাই নাকি ?"

"আজ্ঞে অত খুঁটিনাটি জানি না, তবে দেখি উনি ট্রেনে-ট্রেনে ঘোরেন, আর ওঁকে দেখলেই কিছু লোক দুদ্দাড় করে পড়িমরি পালাতে শুরু করে।"

"ও...আমি ভাবলাম কোনওরকমে হয়তো আমাদের গায়ের গন্ধ পেয়ে গেছে ! যাকগে।

এখন আটটা-দশটা পাখা হাওয়া করছে নিতাইদাকে। মাথায়

ডেকচি চাপিয়ে কেউ জল নিয়ে এল। এবার যত লাগে লাগুক, কত আর মগে-মগে করে আনবে !

রেলের ডাক্তার-অফিসাররা শুনে ছুটে এসেছেন। একজন লোক ট্রেনে ভিড়ের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। অফিসাররা চেকারকে ধমকাতে শুরু করে দিলেন, "নিশ্চয় ট্রেনে উঠেই টিকিট চেক করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। বলিহারি আপনাদের বুদ্ধি ! টিকিট ছিল না, তাই ভয়ে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে !"

চেকার বললেন, "বিশ্বাস করুন, আমি টিকিট চাইনি। আমাকে দেখেই..."

"তা অমন চাঁদ-বদনটা নাই-বা দেখালেন ! যান, দুটো লেবু কিনে আনুন !"

"স্টেশনে ট্রেনের মধ্যে ভিড়ের চাপে লোক দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে খবরটা কাগজে বেরোলে রেলমন্ত্রী ছেড়ে কথা বলবেন না। প্রমোশন তো জন্মের মতো গেল, এখন কোথাও ট্রান্সফার না করে দেন।"

এদিকে যমরাজ নিতাইদাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করছেন, "কী নিতাই, কেমন ?"

নিতাইদা চিঁচিঁ করে বলল, "কী ?"

"চড়টা। সামান্য একটু খোঁচা সামলাতে পারলে না !"

"আমার তো আগেই ভিড়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মাথা ঘুরে গেছল।"

যমদূত বলল, "আমাকে যে নুটু-পুটুর অসুখের কথা বলেছিলে, মহারাজকে বলো ! নইলে উনি ভাববেন আমিই বানিয়ে-বানিয়ে বলেছি !"

নিতাইদা বলল, "দাঁড়াও, ওরা লেবু খাওয়াচ্ছে, খেয়ে নিই !"

যমরাজ চেঁচিয়ে বললেন, "না, আমাদের অত সময় নেই ! আর এক মিনিটের তেইশশো ভাগের এক ভাগ···"

লেবুর রস গড়িয়ে পড়ল নিতাইদার ঠোঁট বেয়ে।

রেলকর্মচারীরা সকলে মুখ ঢেকে হায়, হায় করে উঠলেন। মিঃ ভট্টাচার্য ফিসফিস করে মিঃ নন্দর কানে-কানে বললেন, "চাকরি-জীবন ঝরঝরে হয়ে গেল ! সাসপেন্ড করে দেবে না তো !"

নিতাইদা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমার জন্ম তো তেরোশো একচল্লিশের দোসরা অগ্রহায়ণ। তখন রেল-কামরায় পাঁচজনের বেশি লোকই চড়ত না। তা ভিড়ে চেপটে মৃত্যু আমার নামে লেখা হল কী করে ?"

যমরাজ চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন। চিত্রগুপ্ত খাতা দেখে বললেন, "না ভিড়ে চেপটে লেখা নেই, তখন চারদিকে বন-বাদাড় ছিল, প্রচুর সাপখোপ ছিল, তাই লেখা হয়েছিল সর্পাঘাতে মৃত্যু। এখন আমরা সর্পাঘাতগুলোকে ভিড়ে চেপটে করে দিয়েছি।"

যমরাজ বললেন, "ওহে, ও তোমার সর্পাঘাত ছিল।"

সর্পাঘাত শুনে লাফিয়ে উঠল নিতাইদা, "তাই নাকি ? তা হলে মহারাজ লখাকে যে সাপটা দিয়েছিলেন, সেটাই আমাকে দিন, কালনাগিনী !"

"সাপ। না, না, এখন সাপটাপ সব তুলে দেওয়া হচ্ছে। আর···"

মহারাজ ফিসফিস করে যমদূতকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই, লখাটা কে ?"

আজ্ঞে, লখিন্দর, ওই যে বেহুলা-লখিন্দর, ডাকনাম লখা।"

"ও···। হ্যাঁ শোনো, কালনাগিনীর তো বিষই নেই, ছোকরা তো ভয়ে হার্টফেল করেছিল।"

"আজ্ঞে, সে তো তা হলে আরও উত্তম, বিষ নেই মানে বিষের জ্বালাও নেই !" নিতাইদা যেন তা-ধিন তা-ধিন নাচতে লেগে গেল শুয়ে-শুয়ে।

এদিকে যমরাজ বুঝিয়ে যাচ্ছেন, "আরে শুনবে তো কথাটা, তোমার তো মরা নিয়ে কথা, ও সাপে কাটলেও যা, আর ভিড়ে···"

কিন্তু নিতাইদা শুনলে তো, তার এক গোঁ।

রেগে গেলেন যমরাজ, "উঃ, মানুষের দেখছি কামনা-বাসনার শেষ নেই !"

যমদূতকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী করা যায় বলো তো ?"

"আজ্ঞে, মনসাকে একবার ফোন করে দেখুন না !"

মনসা লুডো খেলছিলেন। সঙ্গে রিনা-কুন্দা আরও কে একজন। মনসা উপুড় হয়ে বেশ মনোযোগ সহকারে ছক্কার দান ফেলছেন। তাঁর পর-পর দু'বার ছয় পড়তে একজন আপত্তি করল, "না মানব না।"

সেজন্য মনসা এখন একটু আধশোয়া হয়ে দান ফেলছেন। মুখে একসঙ্গে দুটো পান পুরেছেন। মুখের ভেতরটা দোক্তা আর থুতুতে ভর্তি। হাতের কাছে পিক ফেলার সোনার ভাঁড়।

হঠাৎ ফোন বাজতে বিরক্ত হলেন মনসা। এই দুপুরবেলা কাজ খেয়েদেয়ে কাজ নেই···একজনকে বললেন, "ধর তো, কে কী বলছে শোন !"

সে গলা শুনে চমকে গেল, "এই, মহারাজ, যমরাজ !"

মনসা উঠে এসে ফোন ধরলেন, "হ্যালো !"

"কে, মনসা !"

"হ্যাঁ !"

ছটফট করছেন দান ফেলার জন্য।

"বলুন !"

"একটা কালনাগিনী এক্ষুনি একবার স্টেশনে পাঠাতে হবে !"

"কালনাগিনী। ও এখন কোথায় পাব ? হিমালয় ছাড়া গতি নেই !"

"সে তো অনেক দূর, সুন্দরবনে পাবে না ? তবু খানিকটা কাছাকাছি হত।"

"সুন্দরবনে যত আজেবাজে সাপের আড্ডা, জলা-কাদা জায়গায় শৌখিন সাপ কি থাকতে চায় !"

"তা হলে ?"

"আপনারা কেউ কিছু বলেন না দেখে সাপের কারবার অনেকদিন প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। আপনি চিড়িয়াখানা থেকে নিয়ে নিন না। হ্যাঁ-হ্যাঁ পেয়ে যাবেন ! ছাড়ছি তা হলে ?"

চেকার পর-পর দুটো লেবুই খাইয়েছেন।

"খান, আর দুটো কোয়া ! দু' টাকা জোড়া সিলেটের মিষ্টি লেবু !"

লেবুর রস ভেতরে যেতে ভেতরটা একটু ভাল লাগছে নিতাইদার। ইচ্ছে করলে সে এখন মাথা তুলে দু-চারটে কথা বলতে পারে। কিন্তু মনে-মনে রেলের লোকগুলোকে একটু জব্দ করার জন্য সে প্রায় মরার মতো ঘাপটি মেরে পড়ে রইল।

মহারাজ যমদূতকে বললেন, "ঝাঁ করে একবার চিড়িয়াখানাটা ঘুরে এসো তো। কালনাগিনী থাকলে নিয়ে আসবে, কাজ হয়ে গেলে ফেরত দিয়ে দেব। আঃ, যাও তাড়াতাড়ি !"

যত সময় যাচ্ছে, মহারাজ তত ঘাবড়ে যাচ্ছেন। চিত্রগুপ্ত এইমাত্র টেলিফোন করে জানিয়েছে, আর এক মিনিটের ছাব্বিশশো ভাগের একভাগ মাত্র···।

যমরাজ রাগে দাঁত কড়মড় করতে-করতে পায়চারি করতে লাগলেন।

চেকার নিতাইদাকে ফের গরম দুধ এনে খাওয়াচ্ছেন। তাঁর একার যত দায়-দায়িত্ব। তোমরাই বলে পাঠিয়েছ ভাল করে চেক করতে ধর্মপুর পর্যন্ত প্রায় অর্ধেক প্যাসেঞ্জার টিকিট ছাড়াই যাতায়াত করছে। আর তাঁকেই এখন ধমক, "রেলের আয় বাড়ানোর জন্য বাবুর যেন ঘুম হচ্ছিল না। যান, এক পো গরম দুধ নিয়ে আসুন !"

নিতাইদার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, কী খাওয়াচ্ছ, দুধ না ময়দা-গোলা ? কিন্তু করল না। যা পাচ্ছি খেয়ে নিই, এরই দাম বাজারে দেড় টাকা।

তবে খুব টুকটুক করে খাচ্ছে নিতাইদা। মাঝে-মাঝে দু'এক ঢোক জিভ দিয়ে ঠেলে বের করে দিচ্ছে। সবাই তখন ভাবছে, 'আহা লোকটার গলায় দুধটুকুও যাচ্ছে না, কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে, ও কি আর বাঁচবে !'

নিতাইদা হাতগুলোও শিথিল করে ফেলে রাখল। ডাক্তার বাবু কম্পাউন্ডার মাঝে-মাঝে তুলে খাড়া করে দেয়, কিন্তু জলে-গোলা বালির মতো সঙ্গে-সঙ্গে ঢলে পড়ে।

৪

যমদূত চিড়িয়াখানা থেকে খালি হাতে ফিরে এল।

"না নেই।"

"নেই মানে? চিড়িয়াখানায় কালনাগিনী নেই?"

"ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, "কে মশাই রোজ দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষবে! বেহুলা এই সাপটাকে এমন বাজে অভ্যেস ধরিয়ে দিয়ে গেছে!"

যমদূত জিজ্ঞেস করল, "একটা বিরাট ময়াল আছে, তুলে নিয়ে চলে আসব?"

"না। নিয়ে এসে কী হবে, নিতাই বকসির কালনাগিনী চাই!"

মনসাকে ফোন করলেন। রেগে যে ফেটে পড়বেন, তারও সময় নেই, আর মাত্র এক মিনিটের তিন হাজার ভাগের···

"হ্যালো! মনসা!"

"পাঁচ···পাঁচ পড়্!"

"মনসা শোনো, চিড়িয়াখানায় কোনও কালনাগিনী নেই!"

মনসা পানের পিক ফেলতে-ফেলতে বললেন, "পাশেই সল্ট লেক, ওখানটায় একবার খোঁজ নিন না।"

যমদূত মহারাজকে জানিয়ে দিল, সল্ট লেকে বাড়িঘর-অফিসে একাকার হয়ে গেছে, সেখানে এক কাঠা জায়গার দাম ভারতীয় মুদ্রায় এখন চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা!

মনসা বললেন, "ঠিক আছে আমি খোঁজখবর করে পাঠাচ্ছি, কিন্তু জোগাড় করতে সময় লাগবে।"

যমরাজ বললেন, "আর এক মিনিটের···"

মনসা টেলিফোন রাখতে-রাখতে বললেন, "দেখছি!"

মাথায় হাত দিয়ে বসে-বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। মহারাজ ধপাস করে জনসাধারণের ওই পায়ের ধুলোর ওপরেই রাজপোশাক পরে বসে পড়লেন।

নিতাইদাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য রেলকর্মীরা তোড়জোড় করছে। শেষ চেষ্টা অক্সিজেন দিয়ে যদি কিছু হয়।

নিতাইদার ভেতরে-ভেতরে খুব ইচ্ছে তার আমের ব্যাগটা ঠিক আছে কি না একবার হাতড়ে দ্যাখে। সে মনে-মনে গুনল ক'টা আম ছিল যেন, ন'টা না দশটা? এখানকার পাবলিককে তার জানা আছে, রোগী দেখার নাম করে দুটো-একটা সট্‌কে দেবে।

যমরাজ ধড়মড়িয়ে উঠে আবার ফোন করতে বসলেন, শুনতে পাচ্ছেন ওদিক থেকে পাঁচ-পাঁচ···ছয়-ছয়, ছক্কা!

"আমি এদিকে চুল ছিঁড়ছি আর তুমি কি না লুডো খেলছ!"

"কেন, পাঠিয়ে দিয়েছি তো!"

"পাঠালে তো পৌঁছচ্ছে না কেন?"

"দেখুন লোকজনের ভিড়ে কোথাও আটকে গেছে! আর-একটা ছয়, ছয়···"

"ধুস্!"

যমরাজ রেগে ফোন ছেড়ে দিলেন। স্বর্গের মেয়েরা দিনদিন কী হচ্ছে! কোনও কালচার বলে জিনিস নেই, বসে-বসে লুডো খেলছে! শুয়ে-বসে ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে, আরে মনোযোগ দিয়ে আসনটাও তো করতে পারিস!"

যমদূতকে ডাকলেন, "এই, এদিকে এসো!"

"আজ্ঞে!"

"কী যে ক্যাবলাকান্তর মতো হাতজোড় করে আজ্ঞে-আজ্ঞে করো! যাও, দ্যাখো তো খুঁজে, মনসা বলছে নাকি কালনাগিনী পাঠিয়েছে!"

"পাঠালেও যে ঢুকবে কোন্‌দিকে···দেখি।"

যাই হোক, যমদূত খুঁজে পেয়ে গেল কালনাগিনীকে, ট্রেনের মধ্যেই ছিল. ফুটো দিয়ে নামছিল।

যমদূত জিজ্ঞেস করল, "কী করব, কালনাগিনীকে নিতাই বকসির আমের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব ?"

"তাই দাও ! লোকে জানবে আমের গন্ধে ঢুকে পড়েছে !"

"কিন্তু সাপ এল কোত্থেকে, কেউ যদি খোঁজখবর করে ?"

"ট্রেনের যা অবস্থা দেখলাম, সেখানে কালনাগিনী কেন, অজগরও যদি তার ছেলেপুলে নিয়ে বসবাস করে তবু কেউ সন্দেহ করবে না !"

৫

রেল-ডাক্তার চিৎকার করছেন, "পেসেন্টকে এক্ষুনি অক্সিজেন দিতে হবে, না হলে টেকানো যাবে না।"

চেকার হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন, "হায়, হায়, কী হবে !"

হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন গার্ড সাহেবও ফুকফুক করে কাঁদছেন। এবং দেখতে-দেখতে যখন দুজনে কাছাকাছি হয়েছেন এবং জড়াজড়ি হয়ে গার্ড সাহেব বলছেন, "ভাই রে···" আর চেকার বলছেন, "দাদা !"

নিতাইদা শুয়ে-শুয়ে রগড় দেখছে। সত্যি মরারও যে এত আনন্দ আছে, সে কখনও ভাবতেও পারেনি।

ট্রেনের ঝাড়ুদার, তারই কামরাগুলো ঝাঁটিয়ে পরিষ্কার করার কথা। "কী ঝাঁট দিয়েছ যে বিষে একটা লোকের শরীর লীন হয়ে আসছে ! নিশ্চয় বিষাক্ত কিছু ছিল তারই কামড়ে···"

"দাঁড়াও, তোমার নামে রিপোর্ট করছি, তুমি ট্রেন ঝাঁট দিলে তো বিষাক্ত জিনিসটা থাকল কী করে ? ভদ্রলোক যদি না বাঁচে তা হলে মনে রেখো তোমার চাকরি এখানেই খতম !"

ঝাড়ুদার তারপর থেকে রেল-ডাক্তারের হাঁটু জড়িয়ে তারস্বরে কেঁদে যাচ্ছে।

কিন্তু সকলে দেখছে ডাক্তার পা নাড়তে পারছেন না বটে, কিন্তু চমৎকার হাত নেড়ে যাচ্ছেন। চেঁচাচ্ছেন, "স্ট্রেচার লে আও, জলদি।"

হঠাৎ দেখা গেল চেকার আর গার্ড সাহেব দু'জনে দৌড়তে-দৌড়তে স্ট্রেচার নিয়ে আসছেন। বহনকারীরা ধর্মঘট করেছে কাল থেকে, এত-এত ভারী-ভারী লাশ দুজনের পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাদের ইউনিটে আরও লোক বাড়াতে হবে, আরও কীসব সাত দফা দাবি।

রেল-ডাক্তারই সকলের চেয়ে নার্ভাস, স্টেশনে কারও কিছু হলে আগে তাঁকেই ধরে টানাটানি ! কে কোথায় হাত কাটবে, হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাবে, রাস্তার নোংরা খাবার খেয়ে পেটের গণ্ডগোল বাধাবে সব দেখতে হবে তাঁকে। এখন এ-লোকটি যদি মারা যায়, এর কেস এত জটিল যে, ডাক্তারের সিরিঞ্জে বিষ ছিল কি না ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা হবে, আর সত্যি-সত্যি সেরকম যদি কিছু পাওয়া যায়···ওরে বাবা.! ভাবতে পারছেন না রেল-ডাক্তার। তা হলে শুধু চাকরি যাওয়া নয়, ফাঁসি হবে ! শহিদ ক্ষুদিরামের ফাঁসির ফোটোটা তাঁর মনে ছিল, ক্ষুদিরামের জায়গায় নিজের গলাটা বসিয়ে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন রেল-ডাক্তার।

সে-সময়ও হাঁটু জড়িয়ে ছিল ঝাড়ুদার, সেও অঝোরে কেঁদে যাচ্ছে।

স্টেশনের বড়-অফিসারের স্ত্রী দুপুরে লাউচিংড়ি রেঁধেছিলেন। উপরি পয়সার পুরোটাই তিনি ভাল-মন্দ খেয়ে উড়িয়ে দেন। ভদ্রলোক একটু ধর্মভীরু। তাঁর বিশ্বাস ও-পয়সা সংসারে লাগালে অচিরে সে-সংসারে লালবাতি জ্বলবে। স্কুটার কিনেছেন, তিনি সব সময় এক লিটারের জায়গায় দু'লিটার তেল পোড়ানোর চেষ্টা করেন। বাড়ির সকলকে বাধ্যতামূলক মিলিটারি ট্রেনিং-এর মতো, বাধ্যতামূলক ভিটামিন ওষুধ খাওয়া বরাদ্দ করে দিয়েছেন। তার ওপর আজ দুধপুলি তো কাল মুরগি-মটন ! ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী দেখতে বেশ কুঁদো-কুঁদো হয়েছেন, বড়-অফিসারের দেখলেও ভাল লাগে।

স্টেশনের বেশির ভাগ দায়-দায়িত্ব তাঁর, স্টেশনমাস্টার নামে ছড়ি ঘোরান। ওঁর কাছে রিপোর্ট এলে উনি বলে দেবেন বড় সাহেব আছেন, যা জিজ্ঞেস করার ওঁকেই করুন ! ব্যস খালাস ! রোগীকে যে অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, এ আর উঠবে বলে মনে হয় না। বড়-অফিসার তখন থেকে ভাবছেন, তা হলে কী কৈফিয়ত দেওয়া যায় ? একটা সন্তোষজনক উত্তর তো দিতে হবে !

তিনি ভাবতে-ভাবতে পায়চারি করছেন। ডান হাতটা চুলে মুঠো করা, বাঁ হাত থুতনিতে। লাউচিংড়ি খেয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, উঠে আসতে বেশ দেরি হয়ে গেছে। এখন ঠেলা সামলাও !

বড়-অফিসার চুল আর থুতনি ছেড়ে নিজে-নিজে কান মুললেন, নাক মুললেন। এবং হঠাৎ আবেগের বশে তিন সত্যি করলেন, "আর কখনও অন্যরকম পয়সা ছোঁব না ! এবার থেকে সৎ হব !"

এইসব দেখেশুনে কি না জানি না, নিতাইদা সে সময় মনে-মনে হোহো করে হেসে উঠল।

কিন্তু একটু পরেই শোনা গেল চারদিক থেকে হাউহাউ কান্নার শব্দ। চেকার আর গার্ড-সাহেব কাঁদছেন স্ট্রেচারের হাতল ধরে, রেল-ডাক্তারের হাঁটু জড়িয়ে কাঁদছে ঝাড়ুদার। রেল-ডাক্তারও ব্যান্ডেজ বাঁধার জন্য যে তুলো এনেছিলেন সেই তুলো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে চোখের জল মুছে যাচ্ছেন। দেখেশুনে বড়-অফিসারও কাঁদতে শুরু করে দিলেন, তিনি অবশ্য সঙ্কোচবশত জোরে কেঁদে উঠতে পারলেন না।

নিতাইদা ঠিক চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিট গতেই মারা গেল।

না, কোর্টে কেস উঠল না। ওঁরা মিছিমিছি এত ভয় পাচ্ছিলেন।

পুলিশ এনকোয়ারি করতে এল। রেলকর্মীরা নিতাই বকসিকে ছেড়ে এখন দারোগা সাহেবকে ঘিরে ধরেছে।

দারোগা হেসে বললেন, "আপনারা দশজন আছেন, দশখানা বড় নোট পাব তো ?"

শুনে অনেকক্ষণ পর তাদের সকলের মুখে হাসি ফোটে।

দারোগা ঝাড়ুদারকে বললেন, "যাও, যেখান থেকে পারো একটা সাপ ধরে নিয়ে এসো, জ্যান্ত না হলেও চলবে। কী পারবে তো ?"

"আজ্ঞে···"

"যে-কোনও সাপ, কালনাগিনী বলে চালিয়ে দেব। এখন সাপ আর ক'জন চেনে ! যাও, কুইক !"

দারোগা সাহেব এক হাজার টাকা প্রথমে গুনে নিলেন, তারপর রিপোর্টে লিখলেন, "শ্রীনিতাই বকসি, পিতা স্বর্গত বৃন্দাবন বকসি, নিবাস···"

বড়-অফিসার হাসতে-হাসতে বললেন, "ওটাও স্বর্গত হবে দারোগা সাহেব !"

"কোন্‌টা ?"

"নিতাই বকসি।"

"ইয়েস !"

সঙ্গে-সঙ্গে স্টেশন জুড়ে হাসির রোল পড়ে গেল।

কিন্তু ওদিকে যত সন্ধে হয় নিতাইদা'র স্ত্রী ঘর-বার হতে থাকেন, যত রাত বাড়তে থাকে তাঁর দু'চোখ ছাপিয়ে জল আসে।

নুটু-পুটু ছেলে দুটো বেঁহুশ জ্বরে বিছানায় ছটকাচ্ছে।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

মনোজ মিত্র

রাজার পেটে প্রজার পিঠে

চরিত্র

মহারাজা	সিংহ
জম্বুক	শৃগাল
রাসভ	গর্দভ
দক্ষিণরায়	ব্যাঘ্র
পবননন্দন	হনুমান
ঋক্ষ	ভল্লুক
রাজমাতা	সিংহী
ময়ূর	

[এই বনের রাজামশাই সিংহমশাই হাড়কিপটে। টিপে-টিপে খরচপাতি করেন, করতে না হলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। তাঁর সিংহাসন, তাঁর মুকুটের গায়ের মণিমুক্তো খসে গেছে, তবু সেগুলো পালটাবার নাম নেই, পাছে পয়সা খরচ হয়। সিংহমশাই আজকাল জরি-মখমলের জামাকাপড় পরাও ছেড়েছেন, সব সময় বুকে লোহার বর্ম এঁটে বসে থাকেন। লোহার জিনিস টেঁকে বহুকাল, দামেও শস্তা। বনের ফলপাকুড়ের শুকনো বিচি দিয়ে গাঁথা রাজার গলার মালা। বনরাজ্যের এই রাজসভায় যে ছত্রটির নীচে বসে মহারাজা এখন তন্দ্রায় ঢুলুঢুলু, সেটা নামেই রাজছত্র. আসলে একটা লতাপাতার ছাউনি। খাসপরিচারক রাসভ একটা মস্ত বড় কাঁচা সবুজ তালপাতা দুলিয়ে মহারাজার ঘাড়ের কাছে ফটর-ফটর আওয়াজই ছড়াচ্ছে, বাতাস নামে মাত্র।

তন্দ্রা ছুটে গেল সিংহমহারাজের। চোখ মুছে মস্ত হাই তুলে সোজা হয়ে বসলেন।]

মহারাজা ॥ জম্বুক··· জম্বুক··· ওহে মন্ত্রী জম্বুক··· ওরে হতচ্ছাড়া···

[মন্ত্রী জম্বুক ঢুকল। একহাতে কলস আর একহাতে পাকানো কাগজ।]

জম্বুক ॥ জয় হোক মহারাজের···

মহারাজ ॥ ঘুমোচ্ছিলে নাকি ? আজ বিকেলে বেলতলার ময়দানে জাতির উদ্দেশে আমার যে ভাষণটি দেবার কথা আছে···

জম্বুক ॥ আজ্ঞে সেই ভাষণটিই তো এতক্ষণ ধরে মক্‌সো করলুম···

মহারাজা ॥ পড়ো দেখি কেমন হল··· !

[জম্বুক পাকানো কাগজটা খোলে। দেখা গেল সেটা অন্তত হাতদশেক লম্বা।]

জম্বুক ॥ হে আমার অরণ্যদেশবাসী প্রিয় প্রজাগণ, তোমরা এক-একজন এক-একটা ছাগল !

মহারাজা ॥ সে কী ! সে কী ! সবাই কেন ছাগল হবে, অ্যাঁ ! ছাগল ছাড়া অন্য প্রজা নেই ? হাতি নেই, ঘোড়া নেই··· ? ···মোষ, গণ্ডার, হরিণ, শজারু, খরগোশ ?

জম্বুক ॥ সবই আছে মহারাজ···এখানে ছাগল মানে গোরু !

মহারাজা ॥ গোরু ! ছাগল মানে গোরু ! কোনওখানেই ছাগল মানে গোরু না !

জম্বুক ॥ আহা, গোরু মানে আমি বলতে চাই···যাকে বলে গাধা !

মহারাজা ॥ তুমি বলতে চাইলেই গোরু মানে গাধা হয়ে যাচ্ছে ! কী রে রাসভ ?

রাসভ ॥ তা কী করে হবে প্রভু, আমি তো আমি···আমি তো সে না।

মহারাজা ॥ মন্ত্রীটা দেখছি পাগল হয়ে গেল !

জম্বুক ॥ ও মহারাজ,ছাগল, গোরু, গাধা বলতে আমি বোঝাতে চাইছি বোকা !

মহারাজা ॥ তা হলে বোকাই বলো ! পাঁচরকম বলছ কেন ? টাকাই হোক্, কথাই হোক্, অপচয় দেখলেই আমার ব্রহ্মতালু ঘেমে ওঠে ! *[রাসভকে]* বাতাস কর ! *[জম্বুককে]* নাও পড়ো···

জম্বুক ॥ *[পড়ছে]* প্রজাগণ, দিনকে দিন তোমাদের দাবিদাওয়া বেড়েই চলেছে। মুখে কেবলই নেই-নেই··· কেবলই চাই-চাই ! বনভূমিতে চলাফেরা করার জন্যে কিছুদিন ধরে তোমরা পাকা সড়ক তৈরি করে দিতে বলছ ! কিন্তু আমি বলছি···

মহারাজা ॥ কী ? কী বলছি আমি ?

জম্বুক ॥ আমি বলছি, হাঁটা-চলা করতে সড়ক বানাতে হয় না··· হাঁটা-চলা করলেই পায়ে-পায়ে সড়ক গড়ে ওঠে !

মহারাজা ॥ বাঃ,বা রে জম্বুক ! বাহবা ! এটা তো খুব দিয়েছ ! আহা, এক চালে সড়ক নির্মাণের একগাদা খরচা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছ !

জম্বুক ॥ তারপর শুনুন মহারাজ···

মহারাজা ॥ পড়ো, পড়ো···রাসভ, বাতাস !

জম্বুকক ॥ *[পড়ছে]* তোমাদের দাবি অবিলম্বে বনভূমিতে হাসপাতাল গড়ে দিতে হবে। কিন্তু আমি বলছি ···

মহারাজা ॥ কী এবার কী বলছি ?

জম্বুক ॥ *[পড়ছে]* আমি বলছি, মরণকালে নিজের ঘরে মায়ের কোলে মাথা রেখে মরা ভাল, নাকি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ডাক্তার-নার্স-ঝাড়ুদারদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে পগার পার হওয়া ভাল ? কোন্‌টা চাও ? জবাব দাও···

মহারাজা ॥ *[আনন্দে]* জবাব নেই··· হেঃ হেঃ লা-জবাব !

জম্বুক ॥ *[পড়ছে]* হাসপাতাল একটি সুবৃহৎ আস্তাকুঁড় ! পুঁজ-রক্ত-মাছি-ব্যান্ডেজ। নাকে সর্দি নিয়ে ঢুকবে, পেটে ছুরি-কাঁচি নিয়ে ফিরে আসবে···

মহারাজা ॥ ও হোঃ হোঃ হোঃ···হাঃ হাঃ হাঃ···

রাসভ ॥ ও হোঃ হোঃ হোঃ···হাঃ হাঃ হাঃ···

জম্বুক ॥ *[পড়ছে]* চড়াইপাখির মতো এক-একটা মশা আর আফ্রিকান হায়েনার মতো ধেড়ে-ধেড়ে ইঁদুর রোগীদের বেড়ে উঠে নেমন্তন্ন খাবে ! হাসপাতাল চেয়েছ ···হাসপাতাল মানে জানো তোমরা ?

মহারাজা ॥ কী মানে···মানে কী জম্বুক ?

জম্বুক ॥ হাসপাতাল মানে হুশপাতাল ! অর্থাৎ হাসপাতালে ভরতি হলে বেহুঁশ হয়ে তোমরা হুশ্‌শ্‌ করে পাতালে চলে যাবে···

মহারাজা ॥ *[আনন্দে তালি দিয়ে]* লা-জবাব ! লা-জবাব ! তোমার জবাব নেই মন্ত্রী জম্বুক !

রাসভ ॥ *[চিৎকার করে]* লা-জবাব ! লা-জবাব !

জম্বুক ॥ হাসপাতাল তৈরির বিরাট খরচা আমি কেমন ঠেকিয়ে দিলুম মহারাজ···

মহারাজা ॥ এসো, কাছে এসো। তোমায় একটু চুমু খাই।

জম্বুক ॥ আজ্ঞে না মহারাজ, আপনি একদিন চুমু খেলে আমাকে এক বছর হাসপাতালে থাকতে হবে ! তারচেয়ে এ-মাস থেকে আমার মাইনেটা একটু বাড়িয়ে দিন প্রভু···

মহারাজা ॥ এই তো, মনটা টকিয়ে দিলে।

রাসভ ॥ টকিয়ে দিলে···

মহারাজা ॥ আমার রাজ্যশাসনের মূল নীতিটি হল, খরচা কমাও খাজনা বাড়াও···খরচা কমাও খাজনা বাড়াও···

রাসভ ॥ *[পাখা দোলাতে-দোলাতে ছন্দে-ছন্দে]* খরচা কমাও— খাজনা বাড়াও···খরচা কমাও খাজনা বাড়াও···

মহারাজা ॥ জাতির উদ্দেশে এবং *[জম্বুককে]* তোমার প্রতিও আমার একটাই উপদেশ···খাওয়া কমাও খাজনা বাড়াও···

রাসভ ॥ *[ভাঙা রেকর্ডের মতো বলেই চলেছে]* খরচা কমাও খাজনা বাড়াও···খরচা কমাও খাজনা বাড়াও···

মহারাজা ॥ মাইনে কমাও খাজনা বাড়াও···

রাসভ ॥ *[পূর্ববৎ]* খরচা কমাও খাজনা বাড়াও···

মহারাজা ॥ ইসকুল কমাও খাজনা বাড়াও···

রাসভ ॥ *[পূর্ববৎ]* খরচা কমাও খাজনা বাড়াও···খরচা কমাও খাজনা বাড়াও···

[রাজবিদূষক পবননন্দনের প্রবেশ]

মহারাজা ॥ এই যে বিদূষক পবননন্দন, খরচা কমাও খাজনা বাড়াও···

পবননন্দন ॥ বলছেন তো মহারাজ, প্রজারা তো মানছে না !

মহারাজা ॥ মানছে না !

পবননন্দন ॥ এই তো রাজসভায় আসার পথেই আপনারই একটি প্রজাকে দেখলুম, দেদার খরচাপাতি করে বসে আছে !

মহারাজা ॥ বটে ! বটে ! দুরাচার পাজিটা কে !

পবননন্দন ॥ আপনারই ময়ূর !

মহারাজা ॥ ময়ূর !

পবননন্দন ॥ একটা রংচঙে ফুলতোলা মখমলের জামা কিনে গায়ে পরেছে !

মহারাজা ॥ আচ্ছা !

জম্বুক ॥ ব্যাটা ময়ূর, কোনওবার মাসের খাজনা মাসে জমা দেয় না, একরাশ পাওনা···তার কি না মখমলের জামা !

পবননন্দন ॥ শুধু জামা ! সোনার নূপুর গড়ে পায়ে দিয়েছে !

মহারাজা ॥ অ্যাঁ ! আমার প্রজার পায়ে সোনার নূপুর···আর আমার গলায় কি না···

পবননন্দন ॥ বৈঁচিফলের মালা ! সে কথা আমি বললুম, ময়ূর, মহারাজকে দ্যাখ—দেখে শেখ ! সব থাকতেও তিনি ভিখিরি সেজে আছেন···আর তুই ব্যাটা মনের আনন্দে নূপুর বাজিয়ে ফুলবাগানে নেচে-নেচে গান গাইছিস !

মহারাজা ॥ ফুলবাগান !

পবননন্দন ॥ ঘরের সামনে ফুলের বাগান করেছে···

মহারাজা ॥ দেশের সম্পদ ফুলের চাষ করে নষ্ট করছে ফুলিশটা···

পবননন্দন ॥ আর আপনি হোগলাপাতার ছাতার নীচে বসে আছেন ! তাও বললুম, মহারাজকে দেখেও কি তোর আক্কেল হয় না রে ! আমায় কী জবাব দিলে জানেন ?

মহারাজা ॥ কী ! কী বললে ?

পবননন্দন ॥ মহারাজ কিপ্‌টে !

রাসভ ॥ *[না বুঝে চেঁচায়]* লা-জবাব ! লা-জবাব !

পবননন্দন ॥ *[রাসভকে]* চোপ !

মহারাজা ॥ কিপটে !

পবননন্দন ॥ হাড়কিপটে ! খাজনা বাড়িয়ে যান, কিন্তু খরচার বেলায়···

[খাজনা ও খরচা শব্দ দুটো কানে যেতেই রাসভ চেঁচিয়ে ওঠে]

রাসভ ॥ খরচা কমাও খাজনা বাড়াও···

পবননন্দন ॥ চোপ্ ! ময়ূরব্যাটা ঠোঁটকাটা ! বলে হোগলাপাতার ছাতা আর বৈঁচি-বয়ড়ার মালা···লোকঠকানো ছলাকলা ! মহারাজের কোনও একটি দুষ্ট মতলব রয়েছে···

মহারাজা ॥ *[পবননন্দনকে]* চোপ্ ! কী বললে !

পবননন্দন ॥ আমি না প্রভু, বলেছে ময়ূর !

জম্বুক ॥ দাঁড়ান মহারাজ, এক্ষুনি উল্লুকটার মুণ্ডু ছিঁড়ে আনছি !

মহারাজা ॥ উল্‌কের না, ময়ূরের !

জম্বুক ॥ আজ্ঞে উল্লুক বলতে আমি ময়ূরকেই বোঝাচ্ছি !

মহারাজা ॥ কেন বোঝাবে ! উল্লুক আর ময়ূর দুটো আলাদা জাতি !

পবননন্দন ॥ উলটো-পালটা বোঝালেই হবে ! মহারাজকি গাধা !

মহারাজা ॥ আমি কি গাধা ! *[নিজের প্রতিই ধমক দেয়]* চোপ্ !

জম্বুক ॥ *[হতাশ হয়ে]* ঠিক আছে বাবা, ময়ূরের মুণ্ডুই আনছি···

[জম্বুক-মন্ত্রী বেরিয়ে গেল ।]

মহারাজা ॥ *[ক্ষিপ্ত গলায়]* সকাল থেকে যত উলটো-পালটা বোঝাচ্ছে ! জাতির উদ্দেশে ভাষণ লিখছে আর উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছে । বেড়ালকে বলছে ঘুঘু···ঘুঘুকে বলছে উট ! যত বলছি ওরে তুই খাজনা আর খরচার কথাটা লেখ···

রাসভ ॥ *[সুর করে]* খাজনা বাড়াও খরচা কমাও···

পবননন্দন ॥ ওফ্ ! কানে একবার খাজনা আর খরচা গেলেই হল, ভাঙা রেকর্ড ঘুরিয়ে যাচ্ছে ! বাতাস কর । মহারাজের ব্রহ্মতালু ঘেমে গেছে···

[বেগে সেনাপতি দক্ষিণরায়ের প্রবেশ ।]

দক্ষিণরায় ॥ ভেসে গেছে ! ভেসে গেছে !

পবননন্দন ॥ ভাসেনি,ভাসেনি, ঘেমে গেছে ।

দক্ষিণরায় ॥ না না, বিদূষক ভেসে গেছে !

মহারাজা ॥ চোপ্ ! ঘামা ভাসা বোঝে না !

পবননন্দন ॥ ভাষাজ্ঞান নেই ।

দক্ষিণরায় ॥ মহারাজ, বন্যায় সব ভেসে গেছে !

মহারাজা ॥ বন্যা ! কোথায় বন্যা, সেনাপতি দক্ষিণরায় ?

দক্ষিণরায় ॥ বনভূমির পূর্বাঞ্চলে প্রভু । এবারও প্রচণ্ড বন্যা ! তিন হাজার অধিবাসীর খাদ্যশস্য সব বানভাসি হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে । হাজারকয় বন্যার্ত হরিণ-হরিণী মিছিল করে আপনার প্রাসাদের দিকে ধেয়ে আসছে প্রভু···

[নেপথ্যে বন্যার্তদের চিৎকার ।]

দক্ষিণরায় ॥ ওই,ওই শুনুন মহারাজ, শরণার্থীদের ব্যাকুল আর্তনাদ ! এক্ষুনি ওদের ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে মহারাজ ।

মহারাজ ॥ ত্রাণ করতে হবে ! *[মহারাজা চোখের জল মোছেন]*

দক্ষিণরায় ॥ অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে···

মহারাজা ॥ অন্ন-বস্ত্র তার ওপর বাসস্থান···*[মহারাজা শব্দ করে কাঁদেন ।]*

পবননন্দন ॥ *[স্বগত]* একে মা রাঁধে না—তপ্ত আর পান্তা ।

দক্ষিণরায় ॥ মাথা-পিছু পাঁচ হাজার টাকা দান করুন মহারাজ ।

মহারাজা ॥ পাঁ-চ হা-জা-র !

পবননন্দন ॥ ওরে বাতাস কর্—মাথা ভেসে যাচ্ছে ।

দক্ষিণরায় ॥ তা হলে দু' হাজার করে দিন···

পবননন্দন ॥ তোমার নজরটা বড্ড বড় সেনাপতি দক্ষিণরায়···অত টাকা মহারাজ পাবেন কোথায় ?

দক্ষিণরায় ॥ রাজার টাকার অভাব ! বিশেষত প্রজার এই দুর্দিনে···

পবননন্দন ॥ *[মহারাজাকে]* মাথা-পিছু আট আনা করে দিতে পারবেন মহারাজ···

মহারাজা ॥ *[কেঁদে]* কোথায় পাব পবননন্দন ? থাকলে তো দেব ! নইলে আমার প্রিয় প্রজারা সর্বস্ব হারিয়ে কত আশা নিয়ে রাজদুয়ারে ছুটে এসেছে···আমায় কি বলতে হত !

দক্ষিণরায় ॥ কিন্তু টাকা না হলে ওদের কেমন করে আজ ত্রাণ করব মহারাজ ?

মহারাজা ॥ *[খিঁচিয়ে]* কেন রে টাকা ছাড়া ত্রাণ করা যায় না ? এই তো বললে খাদ্যশস্য ভেসে গিয়েছে । ভেসে আর কদ্দূর যাবে !···যাও ওদের গিয়ে বলো যে যার খাদ্যশস্য খুঁজে পেতে ধরে এনে রাজভাণ্ডারে জমা দিয়ে যাক্ ! তারপর আমি আমার মতো ত্রাণব্যবস্থা করব !

পবননন্দন ॥ বাঃ ! যার যা আছে আগে দিয়ে যাও—তারপর মহারাজ তাঁর মতো ত্রাণ করবেন ! খাসা ব্যবস্থা···সেনাপতি দক্ষিণরায়, হাঁ করে আছ কেন ভাই—মহারাজের আদেশটি ছড়িয়ে দাও···

মহারাজা ॥ *[বিরাট গর্জন করে]* যাও—

[ধমক খেয়ে দক্ষিণরায় ছুটে বেরিয়ে গেল ।]

মহারাজা ॥ আজ কার পোড়া মুখ দেখে উঠেছি বলো তো পবননন্দন ? সকাল থেকে কেবল খরচা-খরচা !

রাসভ ॥ খরচা বাড়াও, খাজনা কমাও···

পবননন্দন ॥ এ হে হে···ব্যাটা উলটো-পালটা গাইছে ! *[রাসভকে]* চোপ ! *[মহারাজাকে]* আমার পোড়ামুখ দেখে ওঠেননি মহারাজ···

[জম্বুকের প্রবেশ]

জম্বুক ॥ ধরে এনেছি প্রভু···

[বাইরে তাকিয়ে] কইরে আয়···

[পায়ের নূপুর বাজাতে-বাজাতে রঙবাহারি পোশাকে সুসজ্জিত ময়ূর ঢুকল ।]

কিছুতে আসবে না । বললুম মহারাজ তোর নাচ-গান উপভোগ করতে চান । তারপর এল । মহারাজকে প্রণাম কর্ ! *[ঘাড় বেঁকিয়ে]*

ময়ূর ॥ নাচ-গান করার আগে আমি কাউকে প্রণাম করি না, কেবল গুরুকে স্মরণ করি···

পবননন্দন ॥ কী টেঁটিয়া দেখছেন প্রভু···

মহারাজ ॥ হুম্ !

জম্বুক ॥ নে, শুরু কর্ তোর নাচ-গান ! তারপর তোর হচ্ছে ! কী হল, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

ময়ূর ॥ *[উদ্ধত ভঙ্গিতে]* আমি শিল্পী । হাত জোড় করে অনুরোধ না করলে আমি নাচিও না, গাইও না···

পবননন্দন ॥ শুনলেন···শুনলেন প্রভু ।

মহারাজ ॥ হুম্ ! *[হাত জোড় করে]* শুরু হোক্ !

[ময়ূর এবার মহারাজকে অভিবাদন জানিয়ে নাচতে-নাচতে গান ধরল ।]

ময়ূর ॥ *[গান] বনের দেশের কিপটে রাজা*
ছেঁড়া জুতো নোংরা মোজা···
হাওয়া খাবেন তালপাখায়
বৈঁচিমালা দুলছে গলায়···
রাজামহাই হাড়কিপটে
রান্না করেন রেপসিড্যে !

[মহারাজা চাপা গর্জন করেন । পবননন্দন কোমর বেঁধে কবির লড়াইতে নামে ।]

পবননন্দন ॥ *[গান] ওরে ব্যাটা টেঁটিয়া*
কথা বল্ বুঝিয়া···
রেপসিড় দামে শস্তা
লুচি হয় খাস্তা খাস্তা···

ময়ূর ॥ *[গান] রাজা তোমার এ কী কর্ম*
জামার বদলে লোহার বর্ম···

পবননন্দন ॥ *[গান] লোহার বর্ম কাচতে ধোপা*
লাগে না রে ওরে বোকা
খরচা বাঁচে প্রাণও বাঁচে
তাই না রাজা লোহার সাজে···

ময়ূর ॥ *[গান] সিংহাসনটি নড়বড়ে*
ভেঙে যাবে এক চাপড়ে···

পবননন্দন ॥ *[গান] মার্ দেখি গায়ে তোর*
আছে ব্যাটা কত জোর···

ময়ূর ॥ *[গান] শোনো শোনো মহারাজা*
মিছে তব গরিব সাজা···
রাশি রাশি ধনরত্ন
গুহার তলে রয় লুকানো···

মহারাজা ॥ *[চাপা গর্জনে]* কী করে জানলি ? আমার রত্নগুহার সন্ধান তুই কোথায় পেলি··· ?

ময়ূর ॥ নেচে-নেচে নানা জায়গায় ঘুরি মহারাজ···রত্নগুহাটি চোখে পড়েছে আজ···

মহারাজা ॥ ধর্ ব্যাটাকে ধর্···

[আদেশ পেয়েই রাসভ, পবননন্দন ও জম্বুক ময়ূরের দিকে তেড়ে যায়, ময়ূর নাচের তালে লাফ দিয়ে-দিয়ে সরে যায়, আর গান গায় ।]

ময়ূর ॥ *[গান] শোনো শোনো মহারাজা*
গরিব মেরে গরিব সাজা···
রাশি রাশি ধনরত্ন
গুহার তলে রয় লুকানো···

[ময়ূর সকলের নাগাল এড়িয়ে গাইতে-গাইতে বেরিয়ে যায় । দিশেহারা রাসভ, পবননন্দন, জম্বুক ও মহারাজা এ ওকে জাপটে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে থাকে]

মহারাজা ॥ কোথায় গেল ময়ূরটা ? আমার গা জ্বলে যাচ্ছে···

[সেনাপতি দক্ষিণরায়ের প্রবেশ ।]

দক্ষিণরায় ॥ পুড়ে যাচ্ছে মহারাজ, পুড়ে যাচ্ছে···

মহারাজা ॥ জ্বলে খাচ্ছে !

দক্ষিণরায় ॥ না মহারাজ, পুড়ে যাচ্ছে ! খরায় পুড়ে যাচ্ছে !

জম্বুক ॥ খরা !

দক্ষিণরায় ॥ এই মাত্র পশ্চিম অঞ্চল থেকে আরও একটা মিছিল এসেছে ! প্রচণ্ড খরা ! একফোঁটা বৃষ্টি নেই ! মাঠ-ঘাট ফুটিফাটা ! খেতের ফসল পুড়ে ছাই । জল নেই ! জলাভাবে পশ্চিম বনভূমির শশকেরা কঠিন ব্যামোয় পড়েছে···

[নেপথ্যে সমবেত আর্তনাদ]

ওই শুনুন আর্তনাদ ! মহারাজ, এক্ষুনি একটা লোঙরখানা হোক । চালে-ডালে খিচুড়ি পাকিয়ে দুই মিছিলের আর্তদের প্রাণ বাঁচানো হোক ।

মহারাজা ॥ খিচুড়ি হবে না । তবে···*[থেমে]* হাত পাতো···

[দক্ষিণরায় হাত পাতে । মহারাজা পায়ের ধুলো ওই হাতে দিলেন ।]

নাও, দুই মিছিলের মস্তকে ভাল করে ছড়িয়ে দাওগে । বলো মহারাজের পদধূলিতে অচিরেই ওরা বিপদমুক্ত হবে ।

দক্ষিণরায় ॥ মহারাজ পদধূলিতে আজ আর ঠেকানো যাবে না । ময়ূরের কথা ওরা শুনে ফেলেছে রত্নগুহার মধ্যে আপনার অঢেল ধনরত্ন লুকনো রয়েছে । বস্তুত পচছে ।

পবননন্দন ॥ *[ভেংচি কেটে]* বস্তুত পচছে । ময়ূর কি বস্তুত ওদের মাসতুতো ভাই !

মহারাজা ॥ সেনাপতি দক্ষিণরায়, মিছিল দুটোকে এক্ষুনি ভাগাও !

পবননন্দন ॥ একটা কাজ করলে হয় না প্রভু ? ধরুন যদি বন্যা-পীড়িতদের খরা-অঞ্চলে আর খরা-পীড়িতদের বন্যা-অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ?

দক্ষিণরায় ॥ তাতে সমস্যার কী সমাধান হবে ?

পবননন্দন ॥ হবে,হবে । তাতে করে যারা জলাভাবে কষ্ট পাচ্ছিল তারা প্রচুর জল পাবে, আর যারা জলে হাবুডুবু খাচ্ছিল তারা শুকনো ডাঙায় চরে বেড়াবে ! মহারাজ, খরা যাক বন্যায়, বন্যা যাক খরায়···

মহারাজা ॥ খরা যাবে বন্যায়···বন্যা যাবে খরায় ! অসাধারণ । অসাধারণ বুদ্ধি তোমার পবননন্দন । এক পয়সা খরচা নেই, দুই মিছিলের ত্রাণ হয়ে গেল ! ওঃ, ভাবা যায় না !

পবননন্দন ॥ তা হলে এবার আমার মাইনেটা বাড়িয়ে দিন মহারাজ···

মহারাজা ॥ দেব । আগে তোমার বুদ্ধিমতো কাজটা হোক্···

জম্বুক ॥ ওর বাড়ালে আমারও বাড়াতে হবে প্রভু···

দক্ষিণরায় ॥ আমারও প্রভু···

রাসভ ॥ আমারও,আমারও···

দক্ষিণরায় ॥ মাত্র সাড়ে পাঁচ টাকা মাইনে···

রাসভ ॥ তাও সব মাসে পাইনে···

জম্বুক ॥ বউ, ছেলেপুলে নিয়ে দু'বেলা খাইনে···

দক্ষিণরায় ॥ প্রভু, খুব বেশি চাইনে···

মহারাজা ॥ আমার হাতে চড় আছে—তোরা বরং তাই নে···

[মহারাজা দুজনের গালে চটাপট চড় মারেন । রাসভ পিছনে লুকোয় । জম্বুক ও দক্ষিণরায়কে ধরেন মহারাজা ।]

মহারাজা ॥ ফের মাইনে-মাইনে করলে তোদের দুটোকে খরা আর বন্যে অঞ্চলে পাঠাব ! চল্, মিছিল দুটোর ব্যবস্থা করে আসি—

[মহারাজা ডাইনে-বাঁয়ে জম্বুক ও দক্ষিণরায়কে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ।]

পবননন্দন ॥ হাঃ হাঃ,আমার মাইনে বাড়ছে ! হাঃ হাঃ,কত সহজে সুগভীর সমস্যার সমাধান করে দিলুম ! মাথা বটে আমার !

[পবননন্দন সিংহাসনে আরাম করে বসে, পেছনে হাত বাড়িয়ে আড়াল থেকে রাসভকে টেনে বার করে ।]

পবননন্দন ॥ মাথায় হাওয়া কর্ !

রাসভ ॥ ওরে আমার কে রে ! আমার কি মাইনে বেড়েছে !

পবননন্দন ॥ হাওয়া কর ! বাড়তি মাইনেটা পেলেই তোকে একধামা ছোলা খাওয়াব !

রাসভ ॥ তা হলে করছি ! *[হাওয়া করতে করতে]* জানেন বিদূষকমশাই, ও-রত্নগুহার ব্যাপারে আমি একটা গুপ্ত-কথা জানি । থাক বাবা, বলব না !

পবননন্দন ॥ এক ছড়া কাঁচকলাও খাওয়াব ।

রাসভ ॥ তা হলে বলছি । ওইসব ধনরত্ন গুছিয়ে নিয়ে মহারাজ শিগগিরই এদেশ ছেড়ে পালাবেন !

পবননন্দন ॥ বলিস কী ?

রাসভ ॥ হ্যাঁ গো । সেদিন আমায় বলছিলেন, কোন্ পাহাড়ের মাথায় একটা সুন্দর সরোবর দেখে রেখেছেন । এদেশে তো অনেক সমস্যা ! ওঁর মাথা তো ঘেমে যাচ্ছে ! তাই ঠিক করেছেন ধনরত্ন নিয়ে সরোবরের ধারে হিরের প্রাসাদ বানিয়ে শেষ জীবনটা আরামে কাটাবেন !

পবননন্দন ॥ ভাল তো । আমরাও তবে যাচ্ছি । সরোবরের প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করে বেড়াব ।

রাসভ ॥ কচু ! কচু ! মহারাজ কাউকে নিয়ে যাবেন না ! নিজের মা'কেও না ! উনি একা-একা থাকবেন !

পবননন্দন ॥ বটে ! মালকড়ি গুছিয়ে নিয়ে একাই ভেগে পড়বে ! আমরা এতকাল তাঁর সেবা করলুম । দাঁড়াও, সরোবরে পালানো দেখাচ্ছি ! কী শয়তান, তলে-তলে এই সব হচ্ছে !

রাসভ ॥ এইজন্যেই তো···খরচা কমাও খাজনা বাড়াও···খরচা কমাও খাজনা বাড়াও···

[রাসভ ছন্দে-ছন্দে পবননন্দনকে বাতাস করছে । জম্বুক ঢোকে ।]

জচ্চমবুক ॥ *[বুড়ো আঙুল নাচায় আর হাসে]* হয়নি···তোমার বুদ্ধিতে কোনও কাজ হয়নি পবননন্দন । খরার দল বন্যেতে ভাসতে যাবে না···বন্যের দল খরায় পুড়তে যাবে না, মাইনেও তোমার

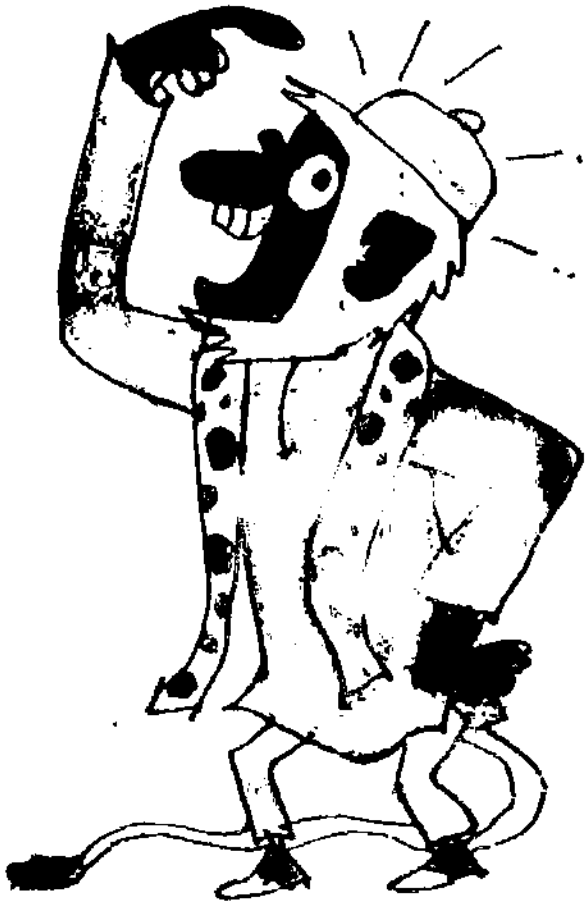

বাড়বে না ! হ্যাঁ হ্যাঁ···

পবননন্দন ॥ থামো ! মাইনে আমার চাইনে ! মহারাজ কোথায় ?

জম্বুক ॥ মহারাজ ঘেরাও !

পবননন্দন ॥ ঘেরাও !

জম্বুক ॥ তাই তো ! খরার দল আর বন্যের দল বোঁচকাবুঁচকি পাতিয়ে রাজবাড়ির চাতালে বসে পড়েছে ! বলছে যতক্ষণ না কিপটে রাজার হাত খোলে ওরা ওখান থেকে নড়বে না !

পবননন্দন ॥ *[চাপা আনন্দে]* হাত না খুললে ঘেরাও তুলবে না !

রাসভ ॥ *[গলা ফাটিয়ে চেঁচায়]* হাত খোলো, ঘেরাও তোলো···হাত খোলো, ঘেরাও তোলো···

পবননন্দন ॥ থাক্ ! সব বসে থাক্ । সরোবরের যাবার পথ আটকে রাখ !

জম্বুক ॥ সরোবর !

পবননন্দন ॥ কিছুই জানো না, এদিকে মন্ত্রী হয়েছ জম্বুক !

জম্বুক ॥ সরোবর কোথায় ?

পবননন্দন ॥ তোমার মাথায় ! হাত খোলো, ঘেরাও তোলো, নইলে ডাণ্ডা মারো পিঠে···

[দক্ষিণরায় উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢোকে ।]

দক্ষিণরায় ॥ ভাজছে ! ভাজছে !

পবননন্দন ॥ ভাজছে !

দক্ষিণরায় ॥ গরম তেলে ভাজছে !

পবননন্দন ॥ কে ভাজছে, কাকে ভাজছে ? শরণার্থীরা কি মহারাজকে গরম তেলে ভাজছে ?

দক্ষিণরায় ॥ আরে না···

জম্বুক ॥ তবে কি মহারাজই ওদের ভাজছেন ?

দক্ষিণরায় ॥ আরে দূর ! পিঠে ভাজছে !

পবননন্দসন ॥ পিঠে । খাবার পিঠে !

দক্ষিণরায় ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ···শরণার্থীরা পিঠে ভাজছে !

জম্বুক ॥ এই অবস্থায় পিঠে ভাজছে !

দক্ষিণরায় ॥ তা কী করবে ? কতক্ষণ হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে, তার কোনও ঠিক আছে ? পেটে কিছু দিতে হবে তো !

পবননন্দন ॥ থাক্, থাক্, এক্ষুনি হয়তো বেচারাদের পিঠে ঘা-গুঁতো পড়বে, তার আগে পিঠে খাক্ । তা পিঠের মালমশলা ওরা পেল কোথায় দক্ষিণরায় ?

দক্ষিণরায় ॥ আরে বন্যা-অঞ্চলের হরিণেরা বানে ভেসে-যাওয়া কয়েকটা নারকেল কুড়িয়ে এনেছিল, মহারাজকে ভেট দেবে বলে । আর খরা-অঞ্চলের শশকেরা ঘি-গুড় এনেছিল খানিকটা···এখন কোত্থেকে একটা কড়াই জোগাড় করে এনে নিজেরাই মুখসামালি পিঠে বানিয়ে সবাই মিলে খাবার জোগাড় করছে !

রাসভ ॥ *[জিবে জল এসে গেছে]* মুখসামালি !

জম্বুক ॥ *[জিবের জল বাগ মানে না]* যা মুখে দিলে আর সামলানো যায় না গো···

দক্ষিণরায় ॥ এই এত বড়-বড় টোপা-টোপা মুখসামালি !

পবননন্দন ॥ আহা, আহা, চেহারাটা তো ভুলেই গেছি কিপটে রাজার হাতে পড়ে ! সেই ক্ষীরের পুলির মধ্যে নারকেলের পুর···

জম্বুক ॥ তার মধ্যে কর্পূরের চুর···ভুরভুর ভুরভুর

দক্ষিণরায় ॥ গব্যঘৃতে ভেজে মুড়মুড়

জম্বুক ॥ চিনির রসে চুবিয়ে···

পবননন্দন ॥ মধু মাখিয়ে তুর্‌তুর্···

রাসভ ॥ *[বিকট জোরে]* আঃ কী গন্ধ ছেড়েছে···হুড়মুড় করে গন্ধ ভেসে আসছে···

পবননন্দন ॥ আহা-আহা···*[গান ধরে]*

ওরে মুখসামালি···
কী বা রসে মজালি···
কামাল করিলি তুই মুখসামালি···
[মহারাজা ঢোকেন।]

মহারাজা ॥ চোপ্! অপদার্থ। অপোগণ্ড! *[রাসভকে]* গাধা! *[পবননন্দনকে]* হনুমান! *[জম্বুককে]* শেয়াল! *[দক্ষিণরায়কে]* বাঘের বাচ্চা না ভেড়ার বাচ্চা! গোটা কতক শশক আর হরিণ আমার দেউড়িতে বসে আমাকে ঘেরাও করে পিঠে ভাজছে, আর তোরা ছাগলেরা···

জম্বুক ॥ *[মরিয়া হয়ে]* আমরা কেউ-ই ছাগল না! ছাগলদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের ঢের-ঢের তফাত রয়েছে।

মহারাজা ॥ আমার কাছে তোরা ছাগল!

জম্বুক ॥ তা হলে বুঝুন ভাষায় কেবল আমরাই গোলমাল করি না···।

মহারাজা ॥ চোপ্! আমাকে ঘেরাও-মুক্ত করার কী করছিস!

পবননন্দন ॥ সেই কথাই তো ভাবছি।

মহারাজা ॥ কী ভাবছিস?

পবননন্দন ॥ ভাবছি···ভাবছি···রাসভ, বাতাস কর্!

মহারাজা ॥ আ রে ব্যাটা বিদূষক, তুই আমার সিংহাসনে বসেছিস!

পবননন্দন ॥ আঃ! কেন চেঁচামেচি করছেন! চুপ করে বসুন! আমি এখন প্রচণ্ড গতিতে ভাবছি! ভাবছি কী করে আপনাকে ঘেরাও-মুক্ত করে সরোবরে পাঠানো যায়।

মহারাজা ॥ *[চিৎকার করে ওঠে]* সরোবর!

পবননন্দন ॥ *[চমকে সামলে নেয়]* আজ্ঞে না!

মহারাজা ॥ *[পবননন্দনের কান ধরে সিংহাসনের ওপর থেকে টেনে নামায়]* কী বললি তুই···সরোবর কেন বললি।

পবননন্দন ॥ কেন বলেছি, আমি জানি না! কান ছেড়ে দিন প্রভু! মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে···মুখ-মুখ-মুখ··· ওরে মুখসামালি ···কী বা রসে মজালি···কামাল করিলি তুই মুখসামালি···মুখসামালি খাব ···

[পবননন্দন কান ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।]

মহারাজা ॥ *[সিংহাসনে বসে]* সেনাপতি দক্ষিণরায়···

দক্ষিণরায় ॥ আদেশ করুন প্রভু···

মহারাজা ॥ তোমার গাল দিয়ে এখনও জল গড়াচ্ছে!

[দক্ষিণরায় শব্দ করে জল টেনে নিল]

দক্ষিণরায় ॥ বলুন প্রভু···

মহারাজা ॥ বিপদটা বুঝতে পারছ!

দক্ষিণরায় ॥ হ্যাঁ প্রভু···

মহারাজা ॥ ওই শশক আর হরিণগুলো এমনই বজ্জাত আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে পিঠে ভাজছে! যাতে আমারও জিভে জল আসে। *[মহারাজা জিভের জল সামলালেন]* মানে আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, আমি চিরকাল রেপসিডে থোড়-চচ্চড়ি খেয়েছি, পিঠে খাইনি! *[জিভের জল টেনে]* এক্ষুনি অশ্ববাহিনী নামিয়ে আমার দেউড়ি পরিষ্কার করে দাও!

দক্ষিণরায় ॥ ক্ষমা করবেন প্রভু···

মহারাজা ॥ মানে!

দক্ষিণরায় ॥ দুঃস্থ-আর্তেরা চেয়েচিন্তে নিজেরাই নিজেদের নোঙরখানা খুলেছে! এখন ওদের তাড়ানো উচিত হবে না!

মহারাজা ॥ আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি···হে শার্দূল, তোমার বুকেও মায়া!

জম্বুক ॥ অশ্ববাহিনী কিছুই করতে পারবে না মহারাজ! ঘোড়াদের দাঁড়াবার ক্ষ্যামতা নেই! র‍্যাশনের মাপা দানাপানি খাইয়ে কি প্রতিরক্ষার কার্য করা যায়!

মহারাজা ॥ তবে বিমানবাহিনী মানে বাজপাখিদের নামাও।

জম্বুক ॥ বাজপাখিদেরও ওই অবস্থা! সর্বক্ষেত্রেই তো কিপটেমি করা হয়েছে!

মহারাজা ॥ কী চলেছে না চলেছে শুনতে চাই না! তিন মিনিট সময় দিয়ে আমি অন্দরে যাচ্ছি, ফিরে এসে যেন দেখি শশক আর হরিণের লাশ পড়ে গেছে! *[রাসভকে]* আয়!

[মহারাজার পিছু-পিছু রাসভ পাখা দোলাতে-দোলাতে চলে যাচ্ছে।]

রাসভ ॥ *[যেতে যেতে ঘুরে]* খরচা কমাও খাজনা বাড়াও···খরচা কমাও খাজনা বাড়াও···

[মহারাজা ও রাসভের প্রস্থান।]

জম্বুক ॥ কী করা যায়? মহারাজা তো খেপে গেছেন! এই সময়টায় পবননন্দনটাও পালাল। ওর মাথাটা বেশ কাজ করে।

দক্ষিণরায় ॥ আচ্ছা পবননন্দন সরোবরের কথা কী বলছিল? শুনে মহারাজের চোখ-মুখ পালটে গেল!

জম্বুক ॥ হুঁ, সরোবরটা যে কী আমিও ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না··· *[হঠাৎ গানের কলি মুখে নিয়ে নাচতে-নাচতে ময়ূর ঢোকে।]*

ময়ূর ॥ *[গান]* *সরোবর-সরোবর*

নীলজলে ঢেউ খেলে
সবুজ প্রান্তর
গগনে ডানা মেলে
রামধনু সুন্দর···
কেউ ধরতে পারে না···
কেউ আমায় ধরতে পারে না···
পারে না···পারে না···

[ময়ূর হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেল। তক্ষুনি আর একটা হাসিতে চমকে উঠে জম্বুক ও দক্ষিণরায় ঘুরে দেখল রাজমাতা বৃদ্ধা সিংহী ঢুকছে। বুড়ির এক চোখে চশমার কাচ।]

রাজমাতা ॥ *[ফোকলা গালে হাসতে-হাসতে]* মুখসামালি···*[নাক টেনে]* উঁউঁ···মুখসামালি ভাজার গন্ধ পাচ্ছি গো···উঁঃ উঁঃ···আঃ···

জম্বুক ও দক্ষিণরায় ॥ জয় হোক রাজমাতার···

রাজমাতা ॥ না,না, আমার জয় না। জয় তোমাদের ওই কিপটে রাজার। উঁ উঁ কারা ভাজছে গো মুখসামালি? কত কাল খাইনি···

দক্ষিণরায় ॥ ওই যে! আপনার দরিদ্র প্রজাবর্গ মা-ঠাকরুন···

রাজমাতা ॥ না,না, আমার প্রজা না, ওই কিপটে রাজার প্রজা···এ যক্ষটার প্রজা! আমার প্রজা ছিল যখন তোমাদের বুড়ো মহারাজ বেঁচে ছিলেন! তিনিও গেছেন···প্রজারাও দরিদ্র হয়েছে···আমিও দীনহীন! দু'বেলা থোড়-চচ্চড়ি গিলিয়ে-গিলিয়ে যক্ষি রাজা তার ভাণ্ডার গড়ছে! আমাকে কি রাজার মা বলে মনে হয়? উঃ! উঃ!

জম্বুক ॥ বাতে কষ্ট পাচ্ছেন মা-জননী?

রাজমাতা ॥ গেঁটে বাত গো···চিকিচ্ছেও করায় না···পয়সা খরচা হবে! আমার মরণ নেই গো!

দক্ষিণরায় ॥ এ কী বলছেন মা-ঠাকরুন···

রাজমাতা ॥ নতুন কথা আর কী বলছি বাছা, জানো তো সবই! তোমাদের বুড়ো মহারাজের খরচের হাত ছিল বলে ওই শয়তান তাকে মেরে রাজা হয়ে বসল। ভাইগুলোকে পর্যন্ত মেরে ফেলেছে ও! ভগবান আমাকে কেন নেয় না!

জম্বুক ॥ বসুন মা, বসুন ...

রাজমাতা ॥ বসি! এই ঠাঁয় বসি। একটু মিষ্টি পিঠের গন্ধে বুক ভরে নিই! আঃ! সেই কোন্ ছোটবেলায় আমি এ-বাড়িতে রানি হয়ে এলুম... খিড়কি দোরে একটা দিঘি ছিল... দিঘির পাড়ে ফুলগাছ ছিল... শীতকালে মিঠে রোদ্দুর ছিল। রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে দিঘির পাড়ে বসে— কলাপাতা- পদ্মপাতায় সাজিয়ে নিয়ে কত পিঠেপুলি খেতুম... মুখসামালি, পাটিসাপটা, রসবড়া, সরুচাকলি... খেয়েছি, খাইয়েছি! পালে-পার্বণে প্রজাদের হাতে কত মিষ্টিমেঠাই বিতরণ করেছি...!

জম্বুক ॥ সে রাবণও নেই... সে লঙ্কাও নেই...

রাজমাতা ॥ *[নাক টেনে]* উঁউঁ আঃ! তোমরা আমাকে চাট্টি মুখসামালি খাওয়াতে পারো বাছা... এ-বাড়িতে পিঠে তৈরি নিষেধ... আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে খাব! পারো বাছা...

[পবননন্দন ঢোকে।]

পবননন্দন ॥ পারি মা-জননী, পারি!

রাজমাতা ॥ পারো?

পবননন্দন ॥ পারি! রাজবাড়িতে আজ পিঠে হবে! *[জোরে]* পাচক! পাচক! পিঠে তৈরি করো! মুখসামালি পিঠে!

[মহারাজা ঢোকেন।]

মহারাজা ॥ কে! কে বলছে রে পিঠে হবে।

পবননন্দন ॥ আমি বলছি মহারাজ...

মহারাজা ॥ পিঠের খরচা দেবে কে!

পবননন্দন ॥ আপনি দেবেন!

মহারাজা ॥ চোপ্

রাজমাতা ॥ পিঠে না ঘুঁটে কোন্‌টা হয় দ্যাখো!

মহারাজা ॥ ও! এই বুড়িটার বুঝি খাই-খাই বাই উঠেছে!

পবননন্দন ॥ শুনুন মহারাজ, শরণার্থীদের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে! মহারাজা যদি ওই প্রজাদের মতো পিঠে বানিয়ে খেতে পারেন—তা হলে ওরা ঘেরাও তুলে নেবে।

মহারাজা ॥ তাই নাকি?

পবননন্দন ॥ হ্যাঁ মহারাজ! ওদের এক কথা, কিপটে রাজা হাত খোলো— ঘেরাও তোলো। মহারাজা অন্তত নিজের বাড়িতেও যদি হাত খুলে পিঠেপুলির জন্যে খরচা করতে পারেন, তা হলেও ওরা মেনে নেবে কিপটে রাজার হাত খুলেছে! তা হলেই ওরা সন্তুষ্ট হয়ে ঘেরাও তুলে নেবে!

মহারাজা ॥ তা হলে হোক্ পিঠে!

দক্ষিণরায় ॥ হোক তা হলে পিঠে!

জম্বুক ॥ পিঠে তা হলে হোক্!

রাজমাতা ॥ যাও বাছারা, রাজ্যের প্রজাদের জানিয়ে দাও... তাদের হতভাগিনী রাজমাতা তাদের হাতে-হাতে আজ গরম-গরম পিঠে বিতরণ করবে!

জম্বুক ॥ ধন্য-ধন্য রাজমাতা!

মহারাজা ॥ মানে। তিন-চার লাখ প্রজার হাতে-হাতে গরম- গরম পিঠে তুলে দিতে হবে!

পবননন্দন ॥ তবেই তো ওরা বুঝবে যে, আপনার হাত খুলেছে মহারাজ!

মহারাজা ॥ শুধু হাত কেন, এতে তো আমার হাত-পা-বুক-মাথা-টেঁধরি পর্যন্ত খুলে যাবে রে! না-না, ও বুড়ির কথায় কান দিয়ো না।

দক্ষিণরায় ॥ তবে প্রজারা অগত্যা বাদ থাক। মা-ঠাকরুন, আপনি কেবল আপনার আত্মীয়স্বজনদেরই ডাকুন।

রাজমাতা ॥ তাই ডাকো তবে। আমার সাত মেয়ে, সতেরো জামাই, নব্বই বেয়াই, একশো সাতাত্তর বেয়ান আর পাঁচশো তেরো নাতি-নাতনি...

দক্ষিণরায় ॥ এক্ষুনি যাচ্ছি...

মহারাজা ॥ ওরে না। আমার ভাণ্ডারটা খালি হয়ে যাবে রে! সাতগুষ্টির পিঠে বন্ধ হোক!

পবননন্দন ॥ না পিঠে হবেই! ঘেরাও তুলতে হাত আপনাকে খুলতেই হবে মহারাজ। শুনুন মা-জননী, বাইরের কাউকে ডেকে কাজ নেই।

জম্বুক ॥ হ্যাঁ, কেবল আমরা-আমরাই সেরে ফেলি! মানে আমরা যারা মহারাজের কাছেপিঠে আছি...

মহারাজা ॥ আহা, কাছেপিঠে আছেন বলে ওনারা পিঠে সাঁটাবেন! কেন রে, হঠাৎ তোদের পিঠে গেলাতে হবে কেন?

জম্বুক ॥ যাক্‌গে, তবে রাজপরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখুন।

মহারাজা ॥ পরিবার! কে কার পরিবার! আমার ছেলে যে আমায় মেরে সিংহাসন দখল করে নেবে না, তার গ্যারান্টি দিতে পারো? মেজো ছেলেটার দৃষ্টি ভাল ঠেকে না!

দক্ষিণরায় ॥ তবে মহারাজ, আপনি আর মা-ঠাকরুনই খান—

মহারাজা ॥ *[ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে]* মা? মা কী করে খাবে? দাঁতই নেই। তাই না মাগো?

রাজমাতা ॥ বাঁধিয়েও তো দিবি না! এক চোখে ছানি পড়েছে বলে, এক চোখের চশমা কিনে দিয়েছে! দ্যাখো, এমন আধখানা চশমা কেউ দেখেছ?

[চশমাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে]

ওই হতচ্ছাড়া আমাকে খাওয়াবে পিঠে! খা-খা- তুই একাই খা! একাই খা! সারা দেশ বঞ্চিত করে তুই একাই খা! উঃ-উঃ....

[রাজমাতা পা টানতে-টানতে চলে গেল।]

পবননন্দন ॥ তবে তাই খান মহারাজ, তবু একটু হাতটা খুলুক আপনার...

মহারাজা ॥ আমার কথা যদি বলো, আমাব তো পিঠে খেতে ইচ্ছেই করছে না!

পবননন্দন ॥ তবে তো ওদের কথাই ঠিক হল মহারাজ, কিপটে রাজার হাত শেষ পর্যন্ত খুলল না!

[বাইরে কোলাহল]

দক্ষিণরায় ॥ ওই শুনুন পরণার্থীরা দুয়ো দিচ্ছে!

মহারাজা ॥ দুয়ো দিচ্ছে?

দক্ষিণরায় ॥ বলছে রাজা পাবে না, আমরা পারি...তবু একদিন সবাই মিলে ভাগযোগ করে ভালমন্দ খেতে পারি!

পবননন্দন ॥ আর সব থাকতেও রাজা পাবে না! এরপরেও কি চুপ করে থাকবেন মহারাজ? *[বাইরে কোলাহল]*

মহারাজা॥ শেষ করে দে, শেষ করে দে শয়তানগুলোকে! ওরে কে আছিস, কে পারিস ওদের কণ্ঠ থামিয়ে দিতে... কে আছিস...

[রাজার গুপ্তঘাতক ঝক্ষের প্রবেশ]

ঝক্ষ ॥ আমি আছি রাজার সেবক!

মহারাজা ॥ কে? আমার ঝক্ষ এলি?

ঝক্ষ ॥ ঝক্ষ! মহারাজের গুপ্তঘাতক ঝক্ষ! চির অনুগত ঝক্ষ!

[ঝক্ষ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে।]

মহারাজা ॥ পারবি··· পারবি রে ঋক্ষ, শয়তানগুলোর পিঠে খাওয়া জন্মের মতো শেষ করে দিতে পারবি ?

ঋক্ষ ॥ মহারাজ, আপনার আদেশে আমি কত বন্যহস্তী ধরাশায়ী করেছি·· কত গণ্ডারের পেট চিরে দিয়েছি··· আপনার পিতৃদেবকেও যমালয়ে পাঠিয়েছি··· আর এরা তো নেহাত শশক-হরিণ ! হাঃ হাঃ ! মশা-মাছি !

দক্ষিণরায় ॥ ওরে হাজার-হাজারের সঙ্গে তুই খালি হাতে কী করে লড়বি রে ঋক্ষ ?

ঋক্ষ ॥ সেনাপতিমশাই, আমি গুপ্তঘাতক ! লড়াই করতে আমার লাঠিসোটা লাগে না ! গুপ্তপথেই কাজ হাসিল করে নেব !

মহারাজা ॥ তবে যা গুপ্তঘাতক ! এই নে তোকে অগ্রিম দিলুম আমার গলার সবচেয়ে দামি বৈঁচির মালাটি···

[মহারাজা ঋক্ষের গলায় মালা পরিয়ে দিল ।]

ঋক্ষ ॥ এই তো আমার মুক্তামালা ! রাজার গলার বৈঁচি মালা··· ভৃত্যের গলায় রত্নমালা ! আমি চললুম মহারাজ···

[ঋক্ষ প্রস্থানোদ্যত]

পবননন্দন ॥ শোন্— শোন্ রে ঋক্ষ ! কী করে কাজ হাসিল করবি, তার বুদ্ধিটা তোকে বাতলে দিই···

ঋক্ষ ॥ আঃ, পিছু ডাকবেন না বিদূষকমশাই । কেমন করে কাজটা হাসিল করব, যথাসময়ে দেখে নেবেন ! এত মারলুম, ভুল হল না, এবারে কি আর ভুল করব ।

[ঋক্ষের গলা রহস্যময় হয়ে উঠল । একটুক্ষণ পবননন্দনের দিকে তাকিয়ে থেকে ঋক্ষ ছুটে বেরিয়ে গেল । নেপথ্যে কোলাহল ।]

মহারাজা ॥ কী । কী বলছে ওরা ।

জম্বুক ॥ ওই একই কথা । রাজা পারে না··· আমরা পারি ।

মহারাজা ॥ বল্ বল্ ! কতক্ষণ বলবি, আমার ঋক্ষ তোদের যমালয়ে পাঠাল বলে ।

[নেপথ্যে সমবেত কণ্ঠ : রাজা পারে না··· আমরা পারি ।]

দক্ষিণরায় ॥ [বাইরে তাকিয়ে] নাচছে, নাচছে ! পিঠের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ওরা নাচছে !

পবননন্দন ॥ এ আর সহ্য করা যায় না মহারাজ । ব্যাটারা সবার আগে ওদের একবার দেখিয়ে দিন যে আপনিও পারেন ! আপনিও পারেন পিঠে খেতে প্রভু—

[রাজমাতা ঢোকে ।]

রাজমাতা ॥ পারে না··· পারে না । যে পাঁচজনকে ভাগ দিতে জানে না··· সে নিজেও ভোগ করতে পারে না !

মহারাজা ॥ দেখবে ? দেখতে চাও তোমরা । পারি কি পারি না ? সেনাপতি, যাও তো ওদের ওই পিঠের ঝুড়িটা তুলে নিয়ে এসো···

দক্ষিণরায় ॥ সে কী ।

মহারাজা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের পিঠেই ওদের দেখিয়ে-দেখিয়ে খাব । নিয়ে এসো···

রাজমাতা ॥ না, না—ওরে না ! ও কাজ করিস না ।

মহারাজা ॥ *[হা হা করে হেসে]* না কেন ? এক পয়সা খরচা নেই, অথচ পিঠে খাওয়াও হল !

পবননন্দন ॥ তা ছাড়া ভেবে দেখতে গেলে ও-পিঠে তো আপনারই ।

মহারাজা ॥ আমারই !

পবননন্দন ॥ বটেই তো ! ঘি-নারকেল-মধু এসব তো ওরা আপনাকে ভেট দেবে বলেই এনেছিল ! সেই নারকেলের পিঠে ধর্মত, ন্যায্যত আপনারই পেটে যাওয়া উচিত ।

মহারাজা ॥ অ্যাঁ ! আমারই পিঠে ! আর আমি এতক্ষণ তা জানি না ! উফ্ ! আমার জিভে যে জল এসে গেল··· নিয়ে এসো— আমার পিঠে আমার কাছে নিয়ে এসো !

রাজমাতা ॥ সর্বনাশ হবে তোর··· সর্বনাশ হবে !

পবননন্দন ॥ কী হল দক্ষিণরায়, যাও । মেরে-ধরে নিয়ে এসো । প্রজারা বুঝুক পিঠে খেলে পিঠেই সইতে হয় ।

দক্ষিণরায় ॥ ওটা পারব না । কারও মুখের খাবার কেড়ে আনতে পারব না । বিশেষত ওদের··· যারা সব হারিয়ে আজ ভিখারি হয়ে···

মহারাজা ॥ পারবি না । অ্যাঁ পারবি না ?

জম্বুক ॥ যা বলছেন করো··· নইলে তুমিও সব হারাবে ! এসো···

[দক্ষিণরায়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল জম্বুক ।]

রাজমাতা ॥ ধ্বংস হবে··· এ রাজপুরী ধ্বংস হবে ! *[প্রস্থানোদ্যত]*

মহারাজা ॥ যাচ্ছ কোথায় বুড়ি দেখে যাও ··· আমার পিঠে খাওয়া দেখে যাও···

[মহারাজা মায়ের হাত টেনে ধরে]

রাজমাতা ॥ ছাড় ! ছেড়ে দে । ও আমি দেখতে পারব না!

মহারাজা ॥ কেন ? খুব যে বলছিলে, আমি পারি না—ওরাই পারে । খুব তো দুয়ো দিচ্ছিলে ! এবার দ্যাখো, রাজাই পারে, প্রজারা পারে না ।

রাজমাতা ॥ পারবি না রাজা, তুই শেষ পর্যন্ত পারবি না—না—না—

[রাজমাতা চলে গেলেন]

মহারাজা ॥ পারব না । হাঃ হাঃ । আমার কিপটে নামটি এবার ঘুচে যাবে তো বিদূষক ?

পবননন্দন ॥ তা আর বলতে ! হাজার-হাজার শরণার্থীর মুখের পিঠে যে একাই খেতে পারে তাকে কে বলে কিপটে । হাঃ হাঃ হাঃ । মহারাজ চিরদিন রাজারাই খায় পেটে, আর প্রজারাই খায় পিঠে !

মহারাজা ॥ খাব বিদূষক, একদিন প্রাণভরে খাব, ফুর্তি করব । সেদিন আসছে···

পবননন্দন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, পাহাড়ের চূড়ায় নীল সরোবরের তীরে বসে···

মহারাজা ॥ বড় মনোহর জায়গাটি হে । নীল-সবুজ-হলুদে মাখামাখি ! মণিমুক্তো রত্ন দিয়ে একটি প্রাসাদ গড়ব সেই পাহাড়-চূড়োয় । নীল সরোবরে বজরা ভাসিয়ে···

পবননন্দন ॥ হ্যাঁ, এখানে যদি খরচাপাতি করেন—গরিব প্রজারা নেই-নেই, চাই-চাই করবে, কিন্তু সেই সরোবরের তীরে কেউ আপনার নাগালও পাবে না । সেই ভাল প্রভু, বনভূমিটাকে ফতুর করে যতটা পারা যায় গুছিয়ে নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে উঠে পড়ুন···

[মহারাজা এতক্ষণ পবননন্দনের পেটের কথা টেনে বার করছিলেন । এবার তার গলাটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলেন ।]

মহারাজা ॥ কী করে জানলি । সরোবরের কথা কে বলল তোকে ! আমার গুপ্তকথা, কেউ যা জানে না, তুই জানলি কোথা থেকে ?

[পবননন্দন যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে । মন্ত্রী জম্বুক ও সেনাপতি দক্ষিণরায় একটা পিঠের ঝুড়ি ধরাধরি করে নিয়ে ঢুকল ।]

জম্বুক ॥ *এনেছি প্রভু··· কিছুতে ছাড়ে না । ব্যাটারা খুব কাঁদছে ।*

মহারাজা ॥ *[পবননন্দনকে ঠেলে ফেলে দিয়ে]* দাঁড়া, পিঠেগুলো শেষ করে তোকে ধরছি ! আমার ঋক্ষর হাতে ছেড়ে দেব তোকে ।

[মহারাজা পিঠের ঝুড়ির সামনে বসে, দু' চোখ দিয়ে লোভ ঝরে পড়ছে। ঝুড়ি থেকে পিঠে তুলে নিয়ে খেতে লাগল। নেপথ্যে শরণার্থীদের কান্না। মহারাজা রাক্ষসের মতো খাচ্ছেন। ঋক্ষ ছুটে এল।]

ঋক্ষ ॥ *[আতঙ্কে]* ও কী করছেন! না, না, খাবেন না প্রভু···

মহারাজা ॥ *[খেতে-খেতে]* খাব না? আমার পিঠে আমি খাব না?

ঋক্ষ ॥ আর খাবেন না! সর্বনাশ হয়ে যাবে প্রভু! পিঠেতে সেঁকো বিষ!

মহারাজা ॥ *[গালভর্তি পিঠে নিয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন]* অ্যাঁ!

ঋক্ষ ॥ হ্যাঁ প্রভু! এই তো আমার গুপ্তহত্যার কৌশল! ভিড়ের মধ্যে ঢুকে কৌশলে পিঠের ঝুড়িতে বিষ ঢেলে দিয়েছিলুম। পিঠে মুখে দিলেই ওরা মরত! আপনি তাই খেলেন!

জম্বুক ও দক্ষিণরায় ॥ বিষ! বিষ!

মহারাজা ॥ *[আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে।]* কী করলি! কী করলি রে ঋক্ষ···

ঋক্ষ ॥ এ পিঠে আপনি যে কেড়ে এনে খাবেন··· তা তো বুঝতে পারিনি!

[ডুকরে কেঁদে ওঠে।]

মহারাজা ॥ *[বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে]* জ্বলে গেল! জ্বলে গেল!

ঋক্ষ ॥ প্রভু আপনার কত শত্রু এ সুকৌশলে মেরে ফেলেছি··· এবার প্রজা মারতে গিয়ে আপনাকেই মেরে ফেললুম···

[ঋক্ষ কাঁদছে]

পবননন্দন ॥ আহা রাজার পেটে প্রজার পিঠে। সয় না গো সয় না।

মহারাজা ॥ আঃ-আঃ!

দক্ষিণরায় ॥ ওরে রাসভ, বাতাস কর্!

মহারাজা ॥ ডাক্তার ডাকো। ডাক্তার।

জম্বুক ॥ ডাক্তার নেই··· ওষুধও নেই। কিচ্ছু করার নেই।

ঋক্ষ ॥ আমার কোলে মাথাটি রাখুন প্রভু।

[মহারাজার মাথাটি কোলে তুলে নেয় ঋক্ষ। রাসভ ঢুকে সেই ঢাউস তালপাতার পাখাটা দোলাতে শুরু করে।]

জম্বুক ॥ *[কাগজ ও কলম নিয়ে মহারাজার পাশে আসে]* মহারাজ তো চলে যাচ্ছেন··· জাতির উদ্দেশে একটা শেষ ভাষণ দিয়ে যান মহারাজ···

পবননন্দন ॥ লিখে নাও। ওঁরও তো বলার গতিক নেই, আমি ওঁর হয়ে বলে দিচ্ছি। মহারাজ, যদি ভুল বলি আপনি হাতটা এইভাবে নাড়বেন, ঠিক হলে এইভাবে নাড়বেন, কেমন?

[মহারাজা হাত নেড়ে পবননন্দনকে চালিয়ে যেতে বলে।]

পবননন্দন ॥ লেখো, মহাপাপ করেছি আমি। পিতৃহত্যা করেছি। দেশবাসীর মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে রত্নভাণ্ডার গড়েছি। *[মহারাজাকে]* হচ্ছে তো মহারাজ!

[মহারাজ হাত নেড়ে জানিয়ে দেন, হচ্ছে।]

পবননন্দন ॥ বড় সাধ ছিল নীল সরোবরে পালিয়ে যাব, তা আর হল না! *[মহারাজকে]* তাই তো? *[মহারাজ হাত নেড়ে সমর্থন করেন।]* তবে দেশবাসিগণ, আমার শাসননীতি ভুলো না। খরচা কমাও খাজনা বাড়াও। এই নীতি অনুসারে খুব হিসেব করে আমার শ্রাদ্ধশান্তি করবে। শুধু চাল-কলা মেখে পিণ্ডি দেব!

[মন্ত্রী জম্বুক খসখস করে ভাষণ লিখছে।]

আর কিছু বাদ গেল কি মহারাজ?

মহারাজা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ! *[গাঁট থেকে চাবির গোছা বার করে]*

[অতি কষ্টে] রত্নগুহার চাবি···আমার মা'কে দাও···মা যেন সব মণিমুক্তো-হিরে-জহরত বিতরণ করে দেয়···নিঃস্ব প্রজাদের হাতে-হাতে তুলে দেয়···মা যেন দেশমাতার মতো সব দু'হাতে বিলিয়ে দেয়····

[পবননন্দন চাবি নিল।]

জম্বুক ॥ চলো মহারাজের শেষ ইচ্ছেটা পূর্ণ করি পবননন্দন···

পবননন্দন ॥ *[বাইরে তাকিয়ে]* ওরে শরণার্থীরা! কিপটে রাজার হাত খুলেছে···কিপটে রাজার হাত খুলেছে···

দক্ষিণরায় ॥ এবার চলো রত্নগুহার দরজা খুলি!

পবননন্দন ॥ ধন্যবাদ ঋক্ষ। কাজটা ভালই মিটিয়ে দিয়েছিস ভাই···

[পবননন্দন, জম্বুক ও দক্ষিণরায় ছুটে বেরিয়ে গেল। নেপথ্যে শরণার্থীদের আনন্দ-কোলাহল। এখন মৃতপ্রায় মহারাজার মাথাটি কোলে নিয়ে বসে আছে ঋক্ষ, বাতাস করছে রাসভ।]

ঋক্ষ ॥ হ্যাঁ কাজ মিটে গেছে, এবার উঠে পড়ুন মহারাজা।

মহারাজা ॥ *[অতি কষ্টে]* আমি···আমি মরে যাচ্ছি রে ঋক্ষ!

ঋক্ষ ॥ আরে দূর! মধুমাখানো পিঠে খেয়ে কেউ মরে।

মহারাজা ॥ বিষ···সৈ-কো-বি-ষ!

ঋক্ষ ॥ ভুট্! বিষফিস কিচ্ছু ছিল না···স্রেফ একটু ভড়কি দিয়ে আপনার বুকটা কাঁপিয়ে রত্নগুহার দরজাটা খুলিয়ে নিলুম আমরা।

মহারাজা ॥ অ্যাঁ!

ঋক্ষ ॥ আবার কী! আপনার অনুগত গুপ্তঘাতক হয়ে অনেক পাপ করেছি, ময়ূর আর পবননন্দন সেই পাপ কাটাবার পথ দেখাল আমায়। শশক আর হরিণ···বনের সকলেই এবার বেঁচে যাবে!

[নেপথ্যে শরণার্থীদের উল্লাস]

ওই মণিমুক্তো-ধনরত্ন পেয়ে আনন্দে নেচে উঠেছে শরণার্থীরা। সবুন তো, আমিও যাই ওদের মধ্যে। উঠুন, উঠুন, পা ধরে গেল! দূর ছাই ওঠ্ না···

[ঋক্ষ কোলের ওপর থেকে মহারাজার মাথাটি ঠেলে দেয়। মহারাজা তিড়িং করে উঠে বসে কোমরে হাত দিয়ে কিছু খোঁজে···তারপর ডুকরে ওঠে।]

মহারাজা ॥ আমার চাবি···আমার রত্নগুহা···মণিমুক্তো-হিরে-জহরত ···আমার পাহাড়চুড়োর সরোবর, সব চলে গেল রে···

[উল্লসিত ময়ূর, পবননন্দন, জম্বুক ও দক্ষিণরায় ঢুকল।]

ময়ূর ॥ তুমিও এবার যাও। আর কেন? সিংহাসনটি নড়বড়ে··· ভেঙে গেল এক চাপড়ে!···

পবননন্দন ॥ যাও, এবার তোমার সরোবরে যাও···

জম্বুক ॥ উঁ! পিঠে খাবে! গ্যাঁদাল পাতার ছেঁচকি খেয়ে, যাও নীল সরোবরের ধারে বসে হেঁচকি তোলোগে···ভাগ!

ঋক্ষ, জম্বুক, পবননন্দন, ময়ূর ॥ ভাগ্। ভাগ্!

[মহারাজা হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদছেন। এতক্ষণ নীরবে মহারাজার মাথায় পাখা দোলাচ্ছিল রাসভ। এবার দোলানির ছন্দে-ছন্দে সুর করে বলতে থাকে]

রাসভ ॥ খাজনা কমাও খরচা বাড়াও···খাজনা কমাও খরচা বাড়াও···

[পোশাক হবে পশুচরিত্র অনুযায়ী, তবে কোনও মুখোশ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।]

ছবি : দেবাশিস দেব